সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১১৬

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৮৬
৬ষ্ঠ প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৮
ফাল্গুন	১৪১৩
মার্চ	২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

مسئلہ قومیت -এর বাংলা অনুবাদ
ISLAM-O-JATIOTABAD by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 65.00 Only.

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও জাতীয়তা

জাতির সংজ্ঞা

বর্বরতার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য থেকে সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল পথের দিকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপেই 'বহু'র মধ্যে ঐক্যের ভাবধারা সৃষ্টি হয় এবং একই উদ্দেশ্য ও কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য অসংখ্য মানুষের পরস্পর মিলিত হয়ে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার সাথে জীবন যাপন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। সভ্যতার অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এ সামগ্রিক ঐক্যের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়ে যায়। উত্তর কালে এমন একটা সময়ও আসে, যখন এক বিরাট সংখ্যক মানুষ তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বহুসংখ্যক মানুষের এ সমষ্টিকেই রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় 'জাতি'। 'জাতি' এবং 'জাতীয়তা' শব্দ দুটো তাদের পারিভাষিক অর্থের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কৃত হলেও মূলত যে অর্থে তা ব্যবহৃত হয়, তা মূল সভ্যতার মতোই প্রাচীন। মানব সমষ্টির যে রূপকে বর্তমানে 'জাতি' বা 'জাতীয়তা' নাম দেয়া হয়েছে আজিকার ফরাসী, ইংল্যাণ্ড, ইটালি প্রভৃতি জাতীয় দেশগুলোর ন্যায় প্রাচীন মিশর, রোম এবং গ্রীসেও তার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

জাতীয়তার অপরিহার্য উপকরণ

জাতীয়তা প্রথমত এক নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক ভাবধারা থেকে উদ্ভূত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। এক সমষ্টির মানুষ নিজেদের মিলিত স্বার্থ ও কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে এবং সামাজিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এক জাতি হয়ে জীবনযাপন করবে—জাতি গঠনের মূলে এটাই হয় প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি জাতি গঠিত হওয়ার পর জাতীয় বিদ্বেষ ভাবের প্রচণ্ড প্রভাব তার উপর অনিবার্যরূপেই আবর্তিত হয়ে থাকে। এমনকি, এ জাতীয়তা ক্রমশ যতই কঠিন ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে, জাতীয়তার বিদ্বেষ ভাব এবং পার্থক্যবোধও ততই প্রচণ্ড হয়ে উঠে। একটি জাতি যখন নিজের স্বার্থ লাভের এবং নিজেদের কল্যাণ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য নিজেদেরকে পরস্পর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নেয় —অন্য কথায় নিজেদের চতুঃসীমায় জাতীয়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্থাপিত করে তখন উক্ত প্রাচীরের আভ্যন্তরীণ ও বহিরস্থ লোকদের পরস্পরের

মধ্যে 'আপন' ও 'পর' বলে অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্থক্য করবেই। প্রত্যেক ব্যাপারেই নিজেদেরকে অপরের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিবেই। অপরের মুকাবিলায় নিজের প্রতিরক্ষা করবেই। উল্লিখিত 'আপন' ও 'পরের' পারস্পরিক স্বার্থে যদি কখনো সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তখন এ জাতীয়তা নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে—অন্যের স্বার্থ বলি দিতেও তা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। এসব কারণেই সেসবের মধ্যে যুদ্ধ হবে—সন্ধি হবে, কিন্তু এ শান্তি ও সংগ্রাম—উভয় অবস্থায়ই উভয়ের মধ্যে পর্বত সমান পার্থক্যসূচক প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরিভাষায় এ ভাবটিকেই বলা হয় জাতীয়তার অন্ধত্ব। জাতীয়তার এটা অবিচ্ছেদ্য বিশেষত্ব —সর্বাবস্থায় এটা জাতীয়তার সাথে অনিবার্যরূপে যুক্ত হয়ে থাকবেই, তাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই।

জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান

ঐক্য ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্যে বিশেষ একটি কারণেই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে—সে যে কারণেই হোক না কেন। কিন্তু শর্ত এই যে, তাতে এমন বিরাট সংযোজক শক্তি বর্তমান থাকতে হবে—যা বিভিন্ন মানুষকে একই বাণী, একই চিন্তা ও মতবাদ, একই উদ্দেশ্য ও কর্মের জন্য একত্রিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং একদিকে জাতির বিভিন্ন ও অসংখ্য অংশকে জাতীয়তার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে—পরস্পর ওতপ্রোত বিজড়িত করে সকলকে এক সুদৃঢ় ও অটল পর্বতের ন্যায় মযবুত করে দিবে। অপরদিকে ব্যক্তিদের মন ও মস্তিষ্কের উপর এমন প্রভুত্ব করবে যে, সমগ্র জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে তারা যেন সকলেই একত্রিত এবং প্রয়োজন হলে সর্বপ্রকার আত্মদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ঐক্য ও সংগঠনের অসংখ্য দিক থাকতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যত জাতীয়তাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তা ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতীয়তারই ভিত্তি নিম্নলিখিত বিষয়ের কোনো এক প্রকার ঐক্যের উপর স্থাপিত হয়েছে। এবং অন্যান্য আরো বহুবিধ ঐক্য সাহায্যকারী হিসাবে তার সাথে মিলিত হয়েছে ঃ

বংশের ঐক্য ঃ এর ভিত্তিতে বংশীয় জাতীয়তা গঠিত হয়।

স্বদেশের ঐক্য ঃ এর ভিত্তিতে অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে উঠে।

ভাষার ঐক্য ঃ এটা চিন্তা ও মতের ঐক্য বিধানের এক বলিষ্ঠ উপায় হওয়ার কারণে জাতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে।

বর্ণের ঐক্য : এটা একই বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং এ অনুভূতিই অধিকতর উন্নতি লাভ করে অন্যান্য বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

অর্থনৈতিক স্বার্থসাম্য : এটা এক ধরনের অর্থব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে অন্য প্রকার অর্থব্যবস্থার ধারক লোকদের সাথে পৃথক করে দেয়। এর ভিত্তিতে একে অপরের প্রতিকূলে স্বীয় অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ লাভের জন্য সংগ্রাম করে।

শাসন ব্যবস্থার ঐক্য : এটা একই রাজ্যের অধিবাসী প্রজাগণকে একই প্রকার শাসন-শৃংখলার সম্পর্ক সূত্রে সংযোজিত করে এবং অন্য রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের প্রতিকূলে দূরত্বের সীমা নির্ধারণ করে।

প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে বিংশ শতকের এ উজ্জ্বলতম যুগ পর্যন্ত জাতিগঠনের যত মৌলিক উপাদান সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে, তার সবগুলোরই মধ্যে উল্লিখিত উপাদান নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাবে।

আজ থেকে দু-তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, রোমক, ইসরাঈল ও ইরানী জাতীয়তাও উল্লেখিত মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছিল। আর অতি আধুনিককালের জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ ও জাপান ইত্যাদি জাতীয়তাও ঠিক এসব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বিপর্যয়ের উৎসমূল

দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতীয়তার ভিত্তি স্বরূপ গৃহীত উল্লিখিত ঐক্যসমূহ অসংখ্য মানব গোষ্ঠীকে সংযোজিত ও সম্মিলিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সাথে এ ভিত্তিসমূহই যে গোটা মনুষ্যজাতির পক্ষে এক কঠিন ও মারাত্মক বিপদের উৎস হয়ে রয়েছে, তাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ ভিত্তিসমূহই বিশ্বমানবকে শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত করেছে। আর সে বিভাগও এতখানি নির্মমভাবে করা হয়েছে যে, তার একটি অংশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু অপর অংশে সামান্য মাত্র পরিবর্তনেরও সূচনা করা সম্ভব হয় না। এক বংশ অন্য বংশে পরিবর্তিত হতে পারে না। একটি ভৌগলিক দেশ অন্য দেশে পরিবর্তিত হতে পারে না। এক ভাষাভাষী অন্য ভাষাভাষীরূপে বিবেচিত হতে পারে না। এক বর্ণ অন্য বর্ণে রূপান্তরিত হতে পারে না। এক জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ অন্য জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পূর্ণ সমান হতে পারে না। এক রাজ্য কখনো অন্য

রাজ্য হতে পারে না। ফলকথা এই যে, উল্লিখিত ভিত্তিসমূহের উপর যেসব জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে সন্ধি-সমঝোতার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকতে পারে না। জাতীয় বিদ্বেষের কারণে তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিরোধ এবং প্রতিহিংসার এক চিরন্তন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একে অপরকে পর্যুদস্ত করার জন্য চেষ্টা করবেই। পরস্পর যুদ্ধ-লড়াই করে চিরদিনের তরে ধ্বংস হয়ে যেতেও প্রস্তুত হবে। অতপর এ ভিত্তিসমূহেরই উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন জাতীয়তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এভাবে এটা দুনিয়ার বিপর্যয়, অশান্তি ও ধ্বংসকারিতার এক চিরন্তন আগ্নেয়গিরি হয়ে পড়ে। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ, শয়তানের সর্বাপেক্ষা শাণিত হাতিয়ার, এটা দ্বারাই সে তার চিরন্তন দুশমনকে শিকার করে থাকে।

জাহেলী বিদ্বেষ

বস্তুত এরূপ জাতীয়তা স্বভাবতই মানুষের মধ্যে বর্বরতামূলক বিদ্বেষভাব জাগ্রত করে। এটা এক জাতিকে অন্য জাতির বিরোধিতা করার ও তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য প্রলুব্ধ করে। কারণ তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। সত্য, সততা, নিরপেক্ষতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ ধরনের জাতীয়তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এক ব্যক্তি শুধু কৃষ্ণাঙ্গ হওয়াই শ্বেতাংগ ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি এশিয়ার অধিবাসী বলে ইউরোপ বা আমেরিকাবাসীদের নিকট ঘৃণিত, অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত ও অধিকারবঞ্চিত হতে একান্তভাবে বাধ্য। আইনস্টাইনের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেবল ইসরাঈল বংশজাত হওয়ার অপরাধেই জার্মান জাতির নিকট ঘৃণিত। তাশকীদী কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো ছিল বলেই একজন ইউরোপীয় অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার অপরাধে তার রাজ্য কেড়ে নেয়া হলো।[১] নিগ্রোদেরকে জীবন্ত দগ্ধীভূত করা আমেরিকার সভ্য নাগরিকদের পক্ষে কিছুমাত্র অপরাধের কাজ নয়, কারণ তারা নিগ্রো। জার্মান জাতি এবং ফরাসী জাতি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে পারে কারণ তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। এদের একজনের গুণাবলী অন্যের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দোষ ও ত্রুটি বলে নিরূপিত হয়। সীমান্তের

১. তাশকীদী বাচওয়ানা ল্যান্ড-এর বামিংভাটু গোত্রের নেতা এক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে শাস্তিদানের অপরাধে বৃটিশ সাম্রাজ্য তাকে রাষ্ট্রাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। অথচ স্বদেশবাসীদের সাথে এ ফিরিঙ্গি ব্যক্তির দুঃসহ দুর্ব্যবহারের কথা স্বয়ং হাইকমিশনারও স্বীকার করেছেন। পরে তাশকীদী চিরকালের তরে এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি সম্পর্কিত মুকদ্দমার তিনি কখনোই ফায়সালা করবেন না। এ শর্তেই তাকে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু দেশী লোকদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরুর উপর ইউরোপীয়ানরা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না—এরূপ কোনো শর্ত চুক্তিনামায় উল্লিখিত ছিল না।

স্বাধীন আফগানীদের আফগানী হওয়া এবং দামেশকের অধিবাসীদের আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া এমন একটা অপরাধ যে, কেবল এ কারণেই তাদের মাথার উপর বোমারু বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা এবং সে দেশের জনগণকে পাইকারীহারে হত্যা করা ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে একেবারে ন্যায়সংগত। কিন্তু ইউরোপের সুসভ্য (?) অধিবাসীদের উপর এরূপ বোমা নিক্ষেপ করাকে বর্বরতামূলক কাজ বলে তারা মনে করে। মোটকথা এ ধরনের জাতীয় পার্থক্যই মানুষকে সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ করে দেয়। এবং ভবিষ্যতে এ কারণেই নৈতিকতা ও ভদ্রতার চিরন্তন মূলনীতিসমূহও জাতীয়তার ছাঁচে ঢেলে গঠিত হয়। কোথাও যুলুম, কোথাও মিথ্যা এবং কোথাও হীনতা সৌজন্য ও নৈতিক চরিত্রের মূলনীতি বলে নির্ধারিত হয়।

এক ব্যক্তির বংশ এক, অন্য ব্যক্তির বংশ আর এক ; এক ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ, অন্য ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ ; একজন নির্দিষ্ট কোনো পর্বতের পশ্চিম পারে জন্মলাভ করেছে, অন্য ব্যক্তি তার পূর্বদিকে জন্মগ্রহণ করেছে ; এক ব্যক্তি এক ভাষায় কথা বলে, অন্য ব্যক্তি অপর কোনো ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে ; এক ব্যক্তি এক রাষ্ট্রের অধিবাসী, অপর ব্যক্তি অন্য কোনো এক রাষ্ট্রের নাগরিক ; কেবল এ কারণেই কি মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে এবং একজন অযোগ্য, পাপী ও অসৎ ব্যক্তিকে কেবল এজন্যই একজন যোগ্য, সৎ ও সত্যানুসন্ধানীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে ? বাহ্যিক চামড়ার বর্ণ, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও মালিন্যের জন্য দায়ী হতে পারে কি ? নৈতিক চরিত্রের ভাল কিংবা মন্দ হওয়ার সাথে পর্বত বা নদী-সমুদ্রের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি স্বীকার করতে পারেন ? প্রাচ্যের সত্য পাশ্চাত্য গিয়ে বাতিল ও মিথ্যা হয়ে যেতে পারে—একথা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে ? পুণ্য, সৌজন্য ও মনুষত্বের সারবস্তু ধমনীর শোণিত ধারা, মুখের ভাষা, জন্মস্থান ও বাসস্থানের মাটির মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় বলে কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কি মেনে নিতে পারে ? সকল মানুষই যে এ প্রশ্নগুলোর উত্তরে স্বতস্ফূর্ত ও সমবেতভাবে 'না' বলবে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু বংশ বা গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতা এবং তার অন্য সহযোগী উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলারই দুঃসাহস করছে।

জাতীয়তার মৌলিক উপাদান

উল্লিখিত দিকগুলো বাদ দিয়ে জাতীয়তার আধুনিক ভিত্তিসমূহকে তাদের নিজস্ব দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। উপরোল্লিখিত ভিত্তিসমূহ মূলত ও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত, না মরীচিকার ন্যায় একেবারে অন্তসারশূন্য—এখানে আমরা তাই দেখতে প্রয়াস পাব।

গোত্রবাদ

গোত্রবাদ বা বংশবাদ আধুনিক কালের জাতীয়তার একটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এ গোত্রবাদের অর্থ কি ?—নিছক রক্তের সম্পর্ক ও একত্বেরই নাম হচ্ছে গোত্রবাদ। একই পিতা ও মাতার ঔরসজাত হওয়ার দিক দিয়ে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ; এটাই হচ্ছে বংশবাদের প্রথম ভিত্তি। এটাই সম্প্রসারিত হয়ে একটি পরিবাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, এটা হতেই হয় গোত্র এবং বংশ। এ শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে মানুষ তার বংশের আদি পিতা থেকে এতদূরে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন তার উত্তরাধিকারত্ব নিছক কাল্পনিক বস্তুতে পরিণত হয়। তথাকথিত এ বংশের সমুদ্রে বহিরাগত রক্তের অসংখ্য নদীনালার সংগম হয়। কাজেই উক্ত সমুদ্রের 'পানি' যে সম্পূর্ণ খাঁটি ও অবিমিশ্রিত—তার আসল উৎস থেকে উৎসারিত পানি ছাড়া তাতে অন্য কোনো পানির ধারা মিশ্রিত হয়নি, জ্ঞান-বুদ্ধি সমন্বিত কোনো ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে না। এরূপ সংমিশ্রণের পরও একই রক্তের সামঞ্জস্য মানুষ একটি বংশকে নিজেদের মিলন কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতে পারে। তাহলে আদি পিতা ও আদি মাতার রক্তের যে একত্ব দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পরস্পর মিলিত করে, তাকে ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ কেন গ্রহণ করা যেতে পারে না ?-আর দুনিয়ার নিখিল মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ও একই গোত্র সমন্বিত বলে কেন মনে করা যাবে না ? আজ যেসব লোককে বিভিন্ন বংশ বা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা বা 'প্রথম পুরুষ' বলে মনে করা হয়, তাদের সকলেরই পূর্ব পুরুষ উর্ধদিকে কোথাও না কোথাও এক ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এ সকলকেই একই মূল সূত্র থেকে উদ্ভূত বলে স্বীকার করতে হবে। তাহলে 'আর্য' ও 'অনার্য' নামে মানুষের মধ্যে এ বিভেদ কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে ?

স্বাদেশিকতা

স্বাদেশিকতার ঐক্য গোত্রবাদ অপেক্ষাও অস্পষ্ট ও অমূলক। যেস্থানে মানুষের জন্ম হয়, তার পরিধি এক বর্গগজের অধিক নিশ্চয়ই হয় না। এতটুকু স্থানকে যদি সে নিজের স্বদেশ বলে মনে করে, তাহলে বোধ হয় সে কোনো দেশকেই নিজের স্বদেশ বলতে পারে না। কিন্তু সে এ ক্ষুদ্রতম স্থানের চতুর্দিকে শত-সহস্র মাইল ব্যাপী সীমা নির্ধারণ করে ও এ সীমান্তবর্তী স্থানকে সে 'স্বদেশ' বলে অভিহিত করে এবং উক্ত সীমারেখা বহির্ভূত এলাকার সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই বলে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করে। মূলত এটা তার একমাত্র দৃষ্টিসংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় গোটা পৃথিবীকে তার নিজের বলে অভিহিত করতে কোনোই বাধা ছিল না। এক 'বর্গগজ' পরিমিত স্থানের 'স্বদেশ' যে যুক্তির বলে সম্প্রসারিত হয়ে শত-সহস্র বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, ঠিক সেই যুক্তিতেই তা আরো অধিকতর বিস্তার লাভ করে নিখিল বিশ্ব তার স্বদেশে পরিণত হতে পারে। নিজের দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ না করলে মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পারে যে, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি যা কিছুকেই কাল্পনিকভাবে সীমারেখা হিসাবে ধরে নিয়ে একটি এলাকাকে অপর একটি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, প্রকৃতপক্ষে তা একই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ ; কাজেই এ পাহাড়-পর্বত ও নদী-সমুদ্র তাকে সীমাবদ্ধ একটি এলাকায় কিরূপে বন্দী করে দিতে পারে ? সে নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী বলে মনে করে না ? সারা দুনিয়াকে সে তার 'স্বদেশ' বা জন্মভূমি বলে মনে করলে সে নিজেকে গোটা ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসী বলে কেন মনে করে না ? সারা দুনিয়াকে সে তার স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে মনে করলে আর ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসী সমগ্র মনুষ্যজাতিকে 'স্বদেশবাসী' বলে অভিহিত করলে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানটুকুতে তার যে অধিকার আছে, সমগ্র বিশ্বজগতের উপরও সেই অধিকার দাবী করলে তা ভুল হবে কেন ?

ভাষাগত বৈষম্য

ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্যে একই ভাষাভাষী লোকেরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও চিন্তার আদান-প্রদান করার বিপুল সুযোগ লাভ করতে পারে, তা অনস্বীকার্য। এর দরুন জনগণের পরস্পরের মধ্যে অপরিচিতের যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে 'আপন' ও 'নিকটবর্তী' বলে অনুভব করতে পারে। কিন্তু চিন্তা ও মতের বাহন এক হলেই চিন্তা ও মত

যে অভিন্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে—এমন কোনো কথাই নেই। একই মতবাদ দশটি বিভিন্ন ভাষার প্রচারিত হতে পারে এবং এসব বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে চিন্তা ও মতের পরম ঐক্য স্থাপিত হওয়া শুধু সম্ভবই নয়—অতি স্বাভাবিকও বটে। পক্ষান্তরে দশটি বিভিন্ন মত একই ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু একই ভাষায় ব্যক্ত সেই বিভিন্ন মতবাদের লোকেরা পরস্পর বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হতে পারে। অতএব চিন্তা ও মতের ঐক্য—যা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার প্রাণবস্তু—ভাষার ঐক্যের মুখাপেক্ষী নয়। উপরন্তু ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্য হলেই যে চিন্তা ও মতবাদের ঐক্য হবে, তা কেউই বলতে পারে না। এরপর একটি গুরুতর প্রশ্ন জেগে উঠে ঃ মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তার ব্যক্তিগত ভালমন্দ গুণের ব্যাপারে ভাষার কি প্রভাব রয়েছে ? একজন জার্মান ভাষাভাষীকে—সে জার্মান ভাষায় কথা বলে বলেই কি একজন ফরাসী ভাষাভাষীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা যেতে পারে ? বস্তুত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণ বৈশিষ্ট্যই মূলত দেখার বস্তু, ভাষা ইত্যাদি নয়। তবে নির্দিষ্ট একটি দেশের শাসন-শৃংখলা ও যাবতীয় কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ কাজকর্মে সেই দেশের ভাষাভাষী ব্যক্তিই অধিকতর সুফলদায়ক হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানবতাকে বিভক্ত করা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষা বিরোধ কোনো নির্ভুল ভিত্তি কোনোক্রমেই হতে পারে না।

বর্ণ বৈষম্য

মানব সমাজে বর্ণবৈষম্য সর্বাপেক্ষা অধিক কদর্য ও অর্থহীন ব্যাপার। বর্ণ কেবল দেহের একটি বাহ্যিক গুণমাত্র ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মনুষত্বের মর্যাদা তার দেহের জন্য লাভ করেনি, তার আত্মা ও মানবিকতাই হচ্ছে এ মর্যাদা লাভের একমাত্র কারণ। অথচ এর রঙ বা বর্ণ বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে লাল, হলুদ, কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য করার কি যুক্তি থাকতে পারে ? কৃষ্ণ বর্ণের গাভী ও শ্বেত বর্ণের গাভীর দুধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। কারণ দুধই সেখানে মুখ্য, সেখানে রক্ত বা বর্ণের কোনোই গুরুত্ব নেই। কিন্তু মানুষের দেউলিয়া বুদ্ধি আজ মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা থেকে তার দেহাবরণের বর্ণের দিকে আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। এটা অপেক্ষা মর্মান্তিক দুরবস্থা আর কি হতে পারে ?

অর্থনৈতিক জাতীয়তা

অর্থনৈতিক স্বার্থসাম্য মানুষের স্বার্থপরতার এক অবৈধ সন্তান ; এটা কখনোই প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানব শিশু মাতৃগর্ভ থেকেই কর্মশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। চেষ্টা ও সাধনার জন্য এক বিশাল ক্ষেত্র তার সামনে উন্মুক্ত হয়। জীবন যাত্রার অপর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। কিন্তু তার জৈবিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শুধু রিয্কের দ্বার উন্মুক্ত হওয়াকেই সে যথেষ্ট মনে করে না, সেই সাথে অন্যের জন্য সেই দুয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়াকেও সে অপরিহার্য বলে মনে করে। এরূপ স্বার্থপরতার ব্যাপারে কোনো বিরাট মানবগোষ্ঠী সমানভাবে অংশীদার হলে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়, উত্তরকালে তা-ই একটি জাতি হিসাবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে বিশেষ সাহায্য করে। স্থুল দৃষ্টিতে তারা মনে করে ঃ অর্থনৈতিক স্বার্থসাম্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত করে নিয়েছে ; কিন্তু বহু সংখ্যক দল ও জাতি যখন নিজেদের চারপাশে এরূপ স্বার্থপরতার দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করে নেয়, তখন মানুষের জীবন তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের দরুন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়ে। তাদের নিজের স্বার্থপরতাই তাদের পায়ের বেড়ী এবং হাতের হাতকড়া হয়ে বসে—অন্যের রিয্কের দরযা বন্ধ করার প্রচেষ্টায় সে নিজেরই জীবিকা ভাণ্ডারের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলে। আজ আমাদেরই চোখের সামনে এ দৃশ্য স্পষ্টরূপে ভাসমান রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের রাষ্ট্রসমূহ এরই কুফল ভোগ করছে। সংরক্ষণের নিখুঁত উপায় মনে করে তারা নিজেরাই যেসব অর্থনৈতিক দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেগুলোকে কিভাবে যে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে, তাই আজ তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এখনো কি আমরা জীবিকা উপার্জনের জন্য গোষ্ঠী বিভাগ এবং সেই সবের ভিত্তিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক ও নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক বলে মনে করবো না ? বস্তুত আল্লাহর বিশাল দুনিয়ায় আল্লাহরই প্রদত্ত রিয্কের অনুসন্ধান ও উপার্জনের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দান করা, কি অমংগলের অবকাশ থাকতে পারে, তা বুঝতে পারা যায় না।

রাজনৈতিক জাতীয়তা

শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও একই সরকারের অধীন হওয়া মূলত এক অস্থায়ী, ক্ষণভংগুর ও ভিত্তিহীন বস্তু। এর ভিত্তিতে কখনোই সুদৃঢ়, স্থায়ী ও মযবুত জাতীয়তা স্থাপিত হতে পারে না। একই রাষ্ট্রের অধীন প্রজাসাধারণকে তার

আনুগত্য করার সূত্রে গ্রথিত করে এক জাতিরূপে গঠন করার কল্পনা কখনোই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী, আধিপত্যশীল ও দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে, ততদিন পর্যন্ত প্রজাসাধারণ সুসংবদ্ধ হয়ে তার আইনের বন্ধনে বিজড়িত হয়ে থাকে একথা ঠিক ; কিন্তু এ আইনের বাঁধন যখনই একটু শিথিল হয়ে পড়ে, বিভিন্ন ভাবধারার জনগণ নিমেষে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। মোগল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় স্বতন্ত্র রাজনীতিভিত্তিক জাতীয়তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার পথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। শেষকালে তুরস্কের যুবকগণ ওসমানী জাতীয়তার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল বটে ; কিন্তু সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের ন্যায় তা চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অষ্ট্রিয়া হাংগেরীর উদাহরণ ইহা অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ ধরনের ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু এসব ঐতিহাসিক নযীর প্রত্যক্ষ করার পরও যারা রাজনৈতিক জাতীয়তা স্থাপন করা সম্ভব বলে মনে করে, তাদের এ রঙিন স্বপ্ন ও উগ্র কল্পনা-বিলাসের জন্যে তারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

বিশ্বমানবিকতা

উপরের বিশ্লেষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জাতিকে যত ভাগেই বিভক্ত করা হয়েছে, তার একটি বিভাগেরও মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। এগুলো নিছক বৈষয়িক ও স্থূল বিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে দৃষ্টির সামান্য বিশালতাই তার প্রত্যেকটির সীমা চূর্ণ করে দেয়। উক্ত বিভাগগুলোর স্থিতি ও স্থায়ীত্ব মূর্খতার অন্ধকার, দৃষ্টির সসীমতা এবং মনের সংকীর্ণতার উপরই নির্ভরশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যুচ্ছটা যতই স্ফূর্ত ও বিকশিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি যতই তীক্ষ্ণ ও সুদূর প্রসারী হয়, অন্তরের বিশালতা যতই বৃদ্ধি পায়, এ বস্তুভিত্তিক ও স্থূল পার্থক্য যবনিকা ততই উত্তোলিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বংশবাদ মানবতার জন্য এবং আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্বনিখিলতার জন্য নিজ নিজ স্থল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বর্ণ ও ভাষার পার্থক্যের মধ্যেও মানবতার মূল প্রাণবস্তুর ঐক্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর সকল বান্দাহর মিলিত অর্থনৈতিক স্বার্থ বিদ্যমান। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিসীমায় কয়েকটি ছায়ামাত্র পরিদৃষ্ট হয়, সৌভাগ্য সূর্যের আবর্তনে তা ভূ-পৃষ্ঠে গতিশীল, হ্রাস-বৃদ্ধিশীল।

ইসলামের উদার মতাদর্শ

ঠিক একথাই ঘোষণা করেছে ইসলাম। মানুষ ও মানুষের মধ্যে ইসলাম কোনো বৈষয়িক, বস্তুভিত্তিক কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্য সমর্থন করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভূত ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج ـ النساء : ١

"আল্লাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। এবং উভয়ের মিলনে অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

মানুষের জন্মস্থান কিংবা সমাধিস্থানের পার্থক্য কোনো মৌলিক পার্থক্য নয়, মূলত সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক ঃ

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ط ـ

"তিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকেরই জন্য থাকার স্থান এবং সমাধি নির্দিষ্ট হয়ে আছে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৯৮

অতপর বংশ ও পারিবারিক বৈষম্যের নিগূঢ় তত্ত্ব উঘাটন করা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط ـ الحجرات : ١٣

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (তোমাদের মধ্যে) সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

অর্থাৎ দল-গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্যই করা হয়েছে ; পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ, গৌরব-অহংকার বা ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্যে নয়। এ বাহ্যিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে মানবতার মৌলিক ঐক্য ভুলে যাওয়া সংগত হবে না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, বাস্তব কার্যকলাপ এবং সততা ও পাপপ্রবণতা।

অতপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানব সমাজে দলাদলি এবং বিভিন্ন দলের পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহ তা'আলার একটা আযাব বিশেষ। এটা তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতার বিষেই তোমাদেরকে জর্জরিত করে তোলে।

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط - الانعام : ٦٥

"কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিবে এবং তোমাদেরকে পরস্পরের শক্তি আস্বাদন করাবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫

ফিরাউন যেসব অপরাধের দরুন আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত ও দণ্ডিত হয়েছিল, দলাদলি করাকেও কুরআন মজীদে অনুরূপ অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا - القصص : ٤

"ফিরাউন পৃথিবীতে অহংকার ও গৌরব করেছে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।"[১]

–সূরা আল কাসাস ঃ ৪

তারপর বলেছেন যে, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, তিনি মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পৃথিবীর সমগ্র বস্তুকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই বিশেষ কোনো অঞ্চলের দাস হয়ে থাকা মানুষের জন্য জরুরী নয়। বিশাল পৃথিবী তার সামনে পড়ে আছে। একস্থান তার জন্য দুর্গম বা বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেলে অন্যত্র চলে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ। সে যেখানেই যাবে আল্লাহর অসীম ও অফুরন্ত নিয়ামত বর্তমান পাবে।

মানব সৃষ্টির সময় আল্লাহ বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط - البقرة : ٣٠

"আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা প্রেরণ করতে চাই।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ - الحج : ٦٥

১. এ আয়াতে ফিরাউনের সেই ঐতিহাসিক অপরাধের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যখন সে মিশরের কিবতী ও অকিবতীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি ও উভয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কর্মনীতি প্রবর্তন করেছিল।

"দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তা কি দেখতে পাও না ?"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط ـ النساء : ٩٧

"আল্লাহর পৃথিবী কি বিশাল ছিল না ?—একস্থান থেকে অন্যত্র কি তোমরা হিজরাত করে যেতে পারতে না ?"–সূরা আন নিসা ঃ ৯৭

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ـ

"আল্লাহর পথে যে হিজরাত করবে, পৃথিবীতে সে বিশাল স্থান ও বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০০

সমগ্র কুরআন পাঠ করুন, বংশবাদ-গোত্রবাদ কিংবা আঞ্চলিকতা-বাদের সমর্থনে একটি শব্দও কোথায়ও পাওয়া যাবে না ; কুরআন গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত পেশ করেছে। ভূপৃষ্ঠের গোটা মানুষ জাতিকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো জাতি কিংবা কোনো অঞ্চলের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি ; দুনিয়ার মধ্যে কেবল মক্কার সাথেই তার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই মক্কা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط ـ الحج : ٢٥

"মক্কার আসল অধিবাসী ও বাইরের মুসলমান–মক্কাতে সকলেই সম্পূর্ণ রূপে সমান।[১]–সূরা হাজ্জ ঃ ২৫

---

১. এ কারণে বিপুল সংখ্যক ফিকাহবিদ মক্কার ভূ-খণ্ডের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্থাপিত হওয়ার কথা স্বীকার করেননি। হযরত উমর রা. মক্কাবাসীদের নিজেদের ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যেন হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য বহিরাগত লোকেরা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয মক্কা নগরে ঘর-বাড়ীর ভাড়া নিতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি মক্কার শাসনকর্তাকে জনগণকে এরূপ নির্দেশ দেয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন, যেসব লোক নিজেদের অর্থ খরচ করে মক্কায় ঘর-বাড়ী বানিয়েছে, তারা তার ভাড়া নিতে পারে। কিন্তু মাঠ-ময়দান, খোলা জায়গা ও বাড়ীর আংগিনার উপর সর্বসাধারণের অধিকার স্বীকার করতে হবে। রাসূলে করীম স. বলেছেন ঃ

مَكَّةُ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا اُجُوْرُ بُيُوْتِهَا ـ

"মক্কা হেরেম, এখানকার চারণভূমি বিক্রয় করা, ঘর-বাড়ীর ভাড়া নেয়া হালাল নয়। অপর এক ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ انما هى مناخ من سبق –"যে এটা আগে দখল করবে, এটা তারই।" এটা ইসলামের সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল দেশের অবস্থা। অন্যত্র এটা প্রযোজ্য নয়।

মক্কার প্রাচীন অধিবাসী মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ع -

"মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন এ বছরের পর আর মসজিদে হারাম —কা'বার কাছেও না আসে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ২৮

উপরোক্ত স্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে স্বদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার পূর্ণ মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এখন প্রত্যেকটি মুসলমানই বলতে পারে ঃ "প্রত্যেকটি দেশই আমার দেশ, কেননা তা আমার আল্লাহর দেশ।"

গোত্রবাদ ও ইসলামের দ্বন্দ্ব

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায়েই বংশ, গোত্র এবং স্বাদেশিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ ও বৈষম্যই তার পথের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

হযরত মুহাম্মাদ স.-এর নিজ জাতিই ছিল এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। বংশ গৌরব এবং গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত আভিজাত্যবোধ তাদের ও ইসলামের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলতো ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○ - زخرف : ٣١

"কুরআন যদি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রদত্ত কিতাবই হয়ে থাকে, তবে এটা মক্কা বা তায়েফের কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতিই নাযিল হতো।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৩১

আবু জেহেল মনে করতো যে, মুহাম্মাদ স. নবী হওয়ার দাবী করে নিজেদের বংশীয় গৌরবের মাত্রা বৃদ্ধি করছে মাত্র। সে বলেছে ঃ

"আমাদের ও আবদে মানাফ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অশ্বারোহণের ব্যাপারে আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া, আতিথেয়তা ও দান-খয়রাতের ব্যাপারেও আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম, এখন সে বলতে শুরু করেছে যে, আমার নিকট ওহী নাযিল হয়। খোদার শপথ, আমরা মুহাম্মাদকে কখনোই সত্য বলে মানবো না।"

এটা কেবল আবু জেহেলের চিন্তাধারাই নয় ; সমগ্র মুশরিক আরবের এটাই ছিল মস্তবড় ত্রুটি। এজন্য কুরাইশের অন্যান্য সমগ্র গোষ্ঠীই বনী হাশেমদের শত্রুতা করতে শুরু করে। ওদিকে বনী হাশেমের লোকেরাও এ জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই হযরত স-এর সমর্থন ও সাহায্য করতে

থাকে। অথচ তাদের মধ্যে অনেক লোকই তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। 'আবু তালিব গুহায়' বনী হাশেমকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্র এ কারণেই তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। যেসব মুসলিম পরিবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, কুরাইশদের কঠোর নিষ্পেষণ ও নির্মম উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আবিসিনিয়ার দিকে হিজরাত করতে বাধ্য হয় এবং যাদের বংশ অধিকতর শক্তিশালী ছিল তারা নিজেদের বংশীয় শক্তির দৌলতে যুলুম-নিষ্পেষণ থেকে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছিল।

আরবের ইহুদীগণ বনী ইসরাঈল বংশের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলা। তাদেরই প্রচারিত সংবাদের দরুন নবী করীম স.-এর ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই মদীনার অসংখ্য বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু স্বয়ং ইহুদীগণ কেবল বংশীয় আভিজাত্যবোধের দরুনই শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনতে পারেনি। নবাগত নবী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করার পরিবর্তে ইসমাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, এটাই ছিল তাদের আপত্তি। তাদের এ আভিজাত্যবোধ তাদেরকে এতদূর বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছিল যে, তারা তাওহীদবাদীদের পরিবর্তে মুশরিকদের সাথে সংগ স্থাপন করেছিল।

সেখানকার খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল এরূপ। তারাও অনাগত নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ঃ এ নবী সিরীয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন। আরবের কোনো নবীকে স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হিরাক্লিয়াসের নিকট নবী করীম স.-এর ফরমান পৌঁছলে, সে কুরাইশ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ "আরো একজন নবী আসবেন তা আমি জানতাম ; কিন্তু তিনি যে তোমাদের বংশে আসবেন সে ধারণা আমার ছিল না।"

মিশরের মুকাওকাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে সেও বলেছিল ঃ "আরো একজন নবীর আগমন হবে তা আমার জানা ছিল, কিন্তু তিনি সিরীয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন বলেই আমার ধারণা ছিল।"

তদানীন্তন অনারব লোকদের মধ্যেও এ আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। খসরু পারভেজের নিকট যখন হযরত স.-এর চিঠি পৌঁছলো, তখন তাকে কোন্ জিনিস ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল ? সে বলেছিল ঃ "গোলাম জাতির একটি লোক অনারবজগতের বাদশাহকে সম্বোধন করে কথা বলার দুঃসাহস করে !" আরব জাতিকে সে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মনে

করতো। এহেন জাতির মধ্যে সত্যের দিকে ডাকবার মত লোকের জন্ম হতে পারে, সে কথা স্বীকার করতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

ইসলামের দুশমন ইহুদীদের দৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষ ও বংশীয় আভিজাত্যবোধ জাগ্রত করাই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মতো অতিশয় ধারালো হাতিয়ার। মদীনার মুনাফিকদের সাথে যোগ সাধন ছিল এরই জন্য। একবার তারা বুয়াস যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনসার বংশের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও আভিজাত্যের এমন আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল যে, উভয় দলের শাণিত কৃপাণ কোষমুক্ত হওয়ার ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কেই নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○ ال عمران : ١٠٠

"মুসলমান! আহলে কিতাবের একদলের যদি তোমরা অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের দিক থেকে কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০

বংশ ও স্বদেশের এ আভিজাত্যবোধের কারণেই মদীনায় কুরাইশ বংশের নবীকে শাসক হিসেবে এবং মুহাজিরদেরকে আনসারদের খেজুর বাগানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখে মদীনার মুনাফিকগণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বলে বেড়াতো যে, "কুরাইশ বংশের এ সর্বহারা ব্যক্তিরা আমাদের দেশে এসে গর্বে স্ফীত হয়েছে। এরা আদরে লালিত কুকুরের ন্যায়, এখন এরা প্রতিপালককেই কামড়াতে শুরু করেছে।" আনসারদেরকে লক্ষ্য করে সে বললো যে, "তোমরাই এদেরকে মাথায় তুলে নিয়েছ, তোমারই তাদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। তোমাদের ধন-সম্পত্তি থেকে তাদেরকে অংশ দিয়েছ। খোদার কসম, যদি আজ তোমরা এদের সমর্থন ও সহযোগিতা পরিত্যাগ করো, তাহলেই এরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে।" তাদের এসব কথার্বাতার জবাব কুরআন মজীদে এরূপ দেয়া হয়েছে ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَاتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَايَفْقَهُوْنَ ○ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ

اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ○ - المنفقون : ٨-٧

"এরাই বলে বেড়ায় যে, রসূলুল্লাহর সংগী-সাথীদের জন্য কিছুই খরচ করো না, তাহলেই এরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ধন-সম্পদের মালিক যে আল্লাহ তাআলা, একথা এসব মুনাফিকরা বুঝতে পারছে না। তারা বলে যে, আমরা (যুদ্ধের ময়দান থেকে) যদি মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার সম্মান আল্লাহ, রাসূল এবং সমগ্র মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত। কিন্তু মুনাফিকগণ একথা মাত্রই জানে না।"–সূরা মুনাফিকুন ঃ ৭-৮

এরূপ আভিজাত্যবোধের তীব্রতাই আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হযরত আয়েশার উপর দোষারোপ ও কুৎসা রটনার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং খাযরাজের সমর্থনের দরুনই আল্লাহ ও রাসূলের এ দুশমন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

আভিজাত্য ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের পর বংশীয় ও স্বাদেশিকতা ভিত্তিক আভিজাত্য ও হিংসা-বিদ্বেষই হচ্ছে ইসলামের মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু। এ কারণেই শেষ নবী তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনে কুফরের পর সর্বাপেক্ষা বেশী জিহাদ করেছেন আভিজাত্য ও হিংসা-বিদ্বেষের এ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে —এটাকে চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে। হাদীস ও জীবনেতিহাসের যাবতীয় গ্রন্থাবলী খুলে দেখলেই উক্ত কথার সত্যতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। নবী করীম স. মানুষের রক্ত, মাটি, বর্ণ, ভাষা এবং উচ্চ নীচের পার্থক্যকে যেভাবে নির্মূল করেছেন, মানুষের পারস্পরিক বিরোধ বৈষম্যের অস্বাভাবিক ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর চূর্ণ করেছেন এবং মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতিকে সমান ও একীভূত করেছেন, তা চিন্তা করলে সত্যই বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

হযরত স. উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعٰى اِلَى الْعَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ -

"আভিজাত্যবোধ ও হিংসা-দ্বেষের জন্য যে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যে লোক সেদিকে অন্যদের আহ্বান জানায় এবং সে জন্য যে যুদ্ধ সংগ্রাম করে, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না।"

তিনি বলেছেন ঃ

لَيْسَ لاَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰى اَحَدٍ اِلاَّ بِدِيْنٍ وَتَقْوٰى - اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ -

"পরহেযগারী, ধর্মপালন ও ধার্মিকতা ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির উপর কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যেতে পারে না। সকল মানুষই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

বংশ, স্বদেশ, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক পার্থক্যকে তিনি এ বলে চূর্ণ করেছেন ঃ

لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ - بخارى

"আরবের উপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবের উপর আরবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান।"

لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِاَبْيَضَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلاَ لِاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى - زاد المعاد

"অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব হতে পারে।"

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ - بخارى

"কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোন এবং মান—তার পূর্ণ আনুগত্য করো।"

মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমানদের অস্ত্রশক্তি যখন কুরাইশদের গর্বোন্নত ও দুর্বিনীত মস্তককে অবনমিত করেছিল, তখন হযরত রাসূলে করীম স. বক্তৃতা করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

اَلاَ كُلُّ مَا ثُرَةٍ اَوْ دَمٍ اَوْ مَالٍ يُدْعٰى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِىْ هَاتَيْنِ -

"জেনে রাখ, গর্ব, অহংকার, গৌরব ও আভিজাত্যবোধ—প্রভৃতির সকল সম্পদ এবং রক্ত ও সম্পত্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় অভিযোগ আজ আমার এ দু পদতলে নিষ্পিষ্ট।"

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا الاٰبَا -

"হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের সকল হিংসা-দ্বেষ ও গর্ব-অহংকার এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করেছেন।"

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ - لاَفَخْرَ لِلاَنْسَابِ لاَفَخْرَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلاَ لِلْعَجَمِيِّ عَلَى الْعَرَبِيِّ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

"হে মানুষ, তোমরা সকলেই আদম সন্তান ; আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বংশ গৌরবের কোনোই অবকাশ নেই। অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব নেই। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মানিত"

আল্লাহর ইবাদাত সম্পন্ন করার পর নবী করীম স. আল্লাহর সামনে তিনটি কথার সাক্ষ্য এবং আন্তরিক স্বীকৃতি পেশ করতেন। প্রথমত, আল্লাহর কেউ শরীক নেই। দ্বিতীয়ত, হযরত মুহাম্মাদ স. আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। এবং তৃতীয়ত, আল্লাহর বান্দাগণ সকলেই সমানভাবে ভাই ভাই।

ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি

এভাবে যেসব গণ্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈষয়িক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ স্থাপিত হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এগুলোকে চূড়ান্তভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপরোল্লিখিত অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে বিভিন্ন ও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সবগুলোকেই চরম আঘাতে চূর্ণ করে দিয়েছে এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমানাধিকারী করেছে।

জাহেলী যুগের এ বর্বরতাকে নির্মূল করার পর ইসলাম বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জাতীয়তার এক নতুন ধারণা উপস্থাপিত করেছে। ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে ; কিন্তু তা জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে নয় ; তা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্যবিধান পেশ করা হয়েছে—তার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয় মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা-সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ কবুল করবে তারা একজাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমগ্র ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাত। وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার অনুসারীরা নিজেদের পারস্পরিক মতদ্বৈততা ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল একই জাতির মধ্যে গণ্য। وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

এ দুটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই পিতার দুটি সন্তানও ইসলাম ও কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র ও দু জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি একই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

জন্মভূমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের 'স্বদেশ' বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন

হতে পারে। এবং একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।

বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগণ্য, এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে, আর তাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম—সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রঙ।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ একই জাতির মানুষ বলে গণ্য হতে পারে এবং কুফরের কারণে দুজন শ্বেতাঙ্গের দুই জাতিভুক্ত হওয়াও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরে পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার কোনোই মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে মনের-হৃদয়ের ভাষাহীন কথার। কারণ সমগ্র দুনিয়াতে এটাই কথিত হয়, এটাই সকলে বুঝতে পারে। এর দৃষ্টিতে আরব ও আফ্রিকাবাসীর একই ভাষা হতে পারে। এবং দুজন 'আরবের' ভাষাও বিভিন্ন হতে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যও ইসলাম ও কুফরের বৈষম্যের ব্যাপারে একেবারেই অমূলক। অর্থ-সম্পদ নিয়ে এখানে কোনোই বিতর্ক নেই, ঈমানের দৌলত সম্পর্কই হচ্ছে এখানকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের প্রভুত্ব নয় আল্লাহ্র আনুগত্যই এখানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের একমাত্র ভিত্তি। যারা হুকুমাতে ইলাহিয়ার পক্ষপাতী–অনুগত এবং যারা নিজেদেরকে নিজেদের ধন-প্রাণকে এরই জন্য কুরবান করেছে, তারা সকলেই এক জাতি, তারা পাকিস্তানের বাসিন্দা হোক কিংবা তুর্কিস্তানের। আর যারা আল্লাহর হুকুমাতের দুশমন, শয়তানের হাতে যারা নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করেছে, তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা কোন্ রাজ্যের অধিবাসী বা প্রজা, আর কোন্ প্রকার অর্থব্যবস্থার অধীনে বসবাস করছে, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনোই অবকাশ নেই।

এভাবে ইসলাম জাতীয়তার যে সীমা নির্দেশ বা গণ্ডী নির্ধারণ করেছে, তা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জড় ও বৈষয়িক বস্তু নয় ; তা সম্পূর্ণরূপে এক বিজ্ঞানসম্মত গণ্ডী। এক ঘরের দুজন লোক এ গণ্ডীর কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে দূরপ্রাচ্য ও দূরপাশ্চাত্যে অবস্থিত দুজন মানুষ উক্ত গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

مرغ عشق از عالم ارحام نیست
او ز شام و حسام و روم و شام نیست

کوکب بے شرق و غرب و بے غروب
در مدارش نے شمال و نے جنوب

ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। বন্ধুতা আর শত্রুতা সবকিছুই এ কালেমার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো সূত্র এবং কোনো আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে, তাদেরকে কোনো জিনিসই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কোনো ভাষা, গোত্র-বর্ণ, কোনো ধন-সম্পত্তি বা জমির বিরোধ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে মুসলমানদের পরস্পরে কোনো বৈষম্যমূলক সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, সে অধিকার কারো নেই। মুসলিম ব্যক্তি চীনের বাসিন্দা হোক, কি মরক্কোর, কৃষ্ণাঙ্গ হোক, আর শ্বেতাঙ্গ, হিন্দি ভাষাভাষী হোক, কি আরবী ; সিমেটিক হোক, কি আর্য ; একই রাষ্ট্রের নাগরিক হোক, কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী, তারা সকলেই মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা ইসলামী সমাজের সদস্য, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর তারা সৈনিক, ইসলামী আইন ও বিধানের সংরক্ষক। ইসলামী শরীআতের একটি ধারা ইবাদাত, পারস্পরিক লেনদেন, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি—জীবনের কোনো একটি ব্যাপারেও লিঙ্গ, ভাষা বা জন্মভূমির দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য করে না—কাউকেও অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠ বা হীন বলে অভিহিত করে না।

সংগঠন ও বিক্ষেপনের ইসলামী নীতি

কিন্তু ইসলাম সমগ্র মানবিক ও বাস্তব সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে—এরূপ সন্দেহ করলে তা মারাত্মক ভুল হবে। ইসলাম মুসলমানদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলার নির্দেশ দিয়েছে, সম্পর্ক ছিন্ন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে। পিতামাতার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের জন্য জোর তাকিদ করেছে। রক্তের সম্পর্ক সম্পন্ন লোকদের মধ্যে মীরাসী আইন অনুসারে উত্তরাধিকার জারী করেছে, দান-খয়রাতের ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের প্রথম অধিকার স্বীকার করেছে। নিজেদের পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ী এবং ধন-সম্পত্তিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। অত্যাচারীর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছে এবং এ ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহে নিহত ব্যক্তিদেরকে 'শহীদ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। জীবনের

সমগ্র ব্যাপারে, ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সদাচার, প্রেম ও ভালবাসার ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়েছে। দেশ ও জাতির সেবা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করতে কিংবা অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সন্ধি ও সৌজন্যের ব্যবহার করতে ইসলাম নিষেধ করছে, একথা ইসলামের কোনো একটি নির্দেশ থেকেও বুঝা যায় না—তা বুঝানও যেতে পারে না।[১]

মানুষের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রাখার যে নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে, তা ঐসব বাস্তব সম্পর্ক সম্বন্ধের সংগত ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু অবশ্য জাতীয়তার ব্যাপারে ইসলাম ও অ-ইসলামের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। সে পার্থক্য এদিক দিয়েও সুপ্রকট হয়ে উঠেছে যে, দুনিয়ার অন্যান্য মানুষ ঐসব জড় বিষয়ের উপর জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপন করেছে, কিন্তু ইসলাম তার কোনো একটির উপরও জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত বৈষয়িক সম্পর্ক সম্বন্ধ অপেক্ষা ঈমানের সম্পর্কই অগ্রগণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি প্রয়োজন হলে একমাত্র এ একটি দিকের সম্পর্ক রক্ষার জন্য অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্ককে কুরবান করতেও প্রস্তুত হতে হবে। ইসলামের ঘোষণা এই ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ ○ ـ الممتحنة : ٤

"ইবরাহীম এবং তাঁর সংগী-সাথীদের কাজকর্মে তোমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ রয়েছে। তারা স্বদেশী ও বংশভিত্তিক জাতিকে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে

---

১. এখানে জেনে রাখতে হবে যে, অমুসলিম জাতিসমূহের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুটি দিক রয়েছে। প্রথম এই যে, মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয় এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হেতু আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলমানরা তাদের সাথে সহানুভূতি, দয়া, দাক্ষিণ্য, ঔদার্য ও সৌজন্যের ব্যবহার করবে, কারণ মানবতার দিক দিয়ে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি এবং মিলিত উদ্দেশ্য লাভের জন্য সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারও করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্কই তাদেরকেও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না ; এবং মুসলমানগণ ইসলামী জাতীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো হিন্দি, চিনা ও মিসরী যুক্ত জাতীয়তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের দ্বিতীয় দিকটি এ ধরনের মিলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং কুফর ও ইসলাম যুক্ত হয়ে কোনো দিনই একজাতি তৈরি করতে পারে না—তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। তোমাদের সাথে আমাদের চিরকালীন শত্রুতার সূত্রপাত হলো—যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪

ইসলাম বলেছে ঃ

لَاتَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○ـ التوبة : ٢٣

"তোমাদের পিতামাতা এবং ভাইও যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরকে পসন্দ করে ও ভালবাসে, তবে তোমরা তাদেরকেও নিজেদের 'আপন লোক' বলে মনে করবে না। তোমাদের কোনো লোক যদি তাদেরকে বন্ধু বলে মনে করে, তবে সে নিশ্চয়ই যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ২৩

আরো–

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ع ـ تغابن : ١٤

"তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (তোমাদের মুসলমান হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের দুশমন, তাদের সম্পর্কে সাবধান হও।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪

ইসলামের নির্দেশ এই যে, তোমাদের দীন ইসলাম এবং তোমাদের মাতৃভূমির মধ্যে যদি বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তাহলে দীন ইসলামের জন্য মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে চলে যাও। যে ব্যক্তি দীনের ভালবাসার জন্য স্বদেশ-প্রেম ভুলে হিজরাত করতে পারে না সে মুনাফিক, তার সাথে তোমাদের কোনোই সম্পর্ক থাকতে পারে না।

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ـ النساء : ٨٩

"যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরাত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৯

ইসলাম ও কুফরে পার্থক্যের জন্য রক্তের নিকটতম সম্পর্ক বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়। পিতামাতা, ভাই, পুত্র কেবল ইসলামের বিরোধী হওয়ার

কারণেই সম্পর্কহীন হয়। আল্লাহর সাথে শত্রুতা করার কারণে একই বংশের লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। কুফর ও ইসলামের মধ্যে চরম শত্রুতা শুরু হওয়ার ফলে জন্মভূমিকেই পরিত্যাগ করতে হয় অকুণ্ঠচিত্তে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, দুনিয়ার সমগ্র বস্তু এবং সম্পর্কের উপরেই হচ্ছে ইসলামের স্থান। ইসলামের উদ্দেশ্যে অতি অনায়াসেই দুনিয়ার সর্বস্ব কুরবান করা যায়; কিন্তু কোনো জিনিসের জন্যই ইসলামকে ত্যাগ করা যেতে পারে না। অন্য দিকেও অনুরূপ দৃশ্য—অনুরূপ ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। যেসব লোকেরা পরস্পরের মধ্যে রক্ত, স্বদেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি কোনো জড় বস্তুরই সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই, সেসব লোককে ইসলাম নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে—তারা পরস্পর 'ভাই' হয়ে যায়। কুরআন মজীদে সমগ্র মুসলমানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ط - ال عمران : ١٠٣

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, এক সময় তোমরা পরস্পরের প্রকাশ্য দুশমন ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মনে পারস্পরিক ভালবাসা জাগিয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা তাঁর নেয়ামত—ইসলামের দৌলতে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলে। তোমরা নিজেদের (আভিজাত্যবোধ ও হিংসা-দ্বেষের কারণে) এক গভীর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

সকল প্রকার অমুসলিমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط التوبة : ١١

"তারা যদি কুফর ত্যাগ করে তাওবা করে, এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাইরূপে গণ্য হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১

পক্ষান্তরে মুসলমানদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ -

"মুহাম্মাদ স. আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদের সমীপে দুর্বিনীত, ইস্পাত-কঠিন অনমনীয় ও দৃঢ়, কিন্তু নিজেদের পরস্পরের মধ্যে অতুলনীয় স্নেহ-ভালবাসার নিবিড় সম্পর্কে জড়িত।"

—সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯

হযরত নবী করীম স. বলেন ঃ

"আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই, (হযরত) মুহাম্মাদ স. তাঁর নবী। এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবেহকৃত জন্তু আহার করতে প্রস্তুত হবে এবং আমাদের অনুরূপ সালাত আদায় করবে। তারা যখনি এরূপ করবে তখনি তাদের জানমাল আমাদের উপর 'হারাম'। অবশ্য তারপরও হক এবং ইনসাফের খাতিরে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করার পথ উন্মুক্ত থাকবে। তাদের অধিকার অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের সমান হবে এবং তাদের কর্তব্যও অন্যান্য মুসলমানদের কর্তব্যের অনুরূপ।"

—আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ

তারা কেবল যে অধিকার ও কর্তব্যেই সমান হবে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনোদিক দিয়েই তাদের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টির অবকাশ নেই। উপরোক্ত হাদীসের সাথে একথাও উল্লিখিত হয়েছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

"মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে একটি প্রাচীরের ন্যায় মযবুত সম্পর্ক বর্তমান। তার প্রত্যেকটি অংশ অপর অংশকে দৃঢ় করে দেয়।"

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعِيْ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

"পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা ও স্নেহ-বাৎসল্যের দিক দিয়ে মুসলিম জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের সমতুল্য। তার একটি অংগে কোনো ব্যথা অনুভূত হলে গোটা দেহই সেজন্য নিদ্রাহীন ও বিশ্রামহীন হয়ে পড়ে।"

মিল্লাতে ইসলামিয়ার এ 'দেহ'কে নবী করীম স. 'জামায়াত' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ -

"জামায়াতের উপরই আল্লাহর হাত রয়েছে। যে জামায়াতের বহির্ভূত হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ۔

"যে ব্যক্তি অংগুলি পরিমাণ স্থানও জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হবে, সে যেন তার নিজ গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জু ছিন্ন করে দিল।"

এখানেই শেষ নয়, এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ۔

"যে ব্যক্তি তোমাদের জামায়াতে ভাংগন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করবে, তাকে তোমরা 'কতল' কর।"

এবং

من اراد ان يفرق امر الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان۔

مسلم ـ كتاب الإمارة

"এ (ইসলামী) জাতির সুদৃঢ় সূত্রকে যে ব্যক্তি ছিন্ন করতে চাইবে, তাকে তরবারী দ্বারা শায়েস্তা কর—সে যেই হোক না কেন।"

ইসলামী জাতীয়তা কিভাবে গঠিত হলো ?

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রক্ত, মাটি, বর্ণ ও ভাষার মধ্যে কোনোই বৈষম্য ছিল না। ইরানের সালমান ছিলেন এ জাতির একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, "সালমান বিন ইসলাম"—ইসলামের পুত্র সালমান। হযরত আলী রা. তাঁর সম্পর্কে বলতেন—"সালমান আমাদেরই ঘরের লোক।" বাযান বিন্ সাসান এবং তাঁর ছেলে শাহার বিন বাযানও সেই সমাজে বাস করতেন। এরা ছিলেন বহরামগোর-এর বংশধর। হযরত নবী করীম স. বাযানকে ইয়ামানের এবং তাঁর পুত্রকে ছানয়া'র শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। আবিসিনিয়ার নিগ্রো বিলালও ছিলেন এ জামায়াতেরই একজন। হযরত উমর ফারুক রা. তাঁর সম্পর্কে বলতেন—ইনি 'নেতার' দাস এবং আমাদেরও নেতা।" রোমের ছোহাইব-ও এ জাতিরই একজন ছিলেন। হযরত উমর রা. তাঁকে নিজের স্থানে সালাতের ইমামতী করার জন্য নিযুক্ত করতেন। হযরত আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালিম সম্পর্কে হযরত উমর জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেছেন—"আজও সালিম যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে আমার পরবর্তী খলিফার জন্য

আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করতাম। যায়েদ বিন হারেসা ছিলেন একজন ক্রীতদাস, (কিন্তু তিনিও ইসলামী জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে) হযরত নবী করীম স. তাঁর ফুফাতো ভগ্নি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নবকে তাঁর কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। যায়েদের পুত্র উসামাও এ জামায়াতেরই একজন 'সদস্য' ছিলেন—হযরত নবী করীম স. তাঁকে সৈন্যবাহিনীর 'নেতা' নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাতে হযরত আবু বকর, উমর ফারুক, আবু উবায়দা বিন জাররাহ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম সাধারণ সৈনিক হিসাবে শরীক ছিলেন। এ উসামা সম্পর্কেই হযরত উমর রা. তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর নিকট বলেছিলেন—"উসামার পিতা তোমার পিতা অপেক্ষা উত্তম ছিলেন এবং উসামা তোমার অপেক্ষা উত্তম।"

মুহাজিরদের আদর্শ

ইসলামী আদর্শে গঠিত জাতি বা (জামায়াত) ইসলামের শাণিত তরবারির আঘাতে বংশ, স্বদেশ, বর্ণ ও ভাষা প্রভৃতি নামে অভিহিত সকল দেবতা এবং আবহমানকাল থেকে চলে আসা হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তিসমূহ চূর্ণ করেছে। রাসূলে করীম স. নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করলেন এবং সংগী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন। এর অর্থ এই নয় যে, হযরত স. এবং তাঁর সংগী-সাথীদের মনে জন্মভূমির প্রতি কোনো টান—স্বাভাবিক দরদও ছিল না। মক্কা ত্যাগ করার সময় তিনি বলেছিলেন ঃ "হে মক্কা, তুমি আমার কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কিন্তু কি করবো, তোমার অধিবাসীগণ এ দেশে আমাকে থাকতে দিল না।" হযরত বিলাল রা. মদীনায় গিয়ে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি মক্কার এক একটি জিনিস স্মরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সকল মহান ব্যক্তি একমাত্র ইসলামের জন্যই হিজরত করেছিলেন এবং সে জন্য তাঁদের মনে কখনো কোনো ক্ষোভ জাগ্রত হয়নি।[১]

الاليت شعرى هل ابيتن ليلة   بفخ وحولى اذخرو جليل
وهل اردن يوما مياه مجنة   وهل تبدو الى شامة وطفيل

আনসারদের কর্মনীতি

অন্যদিকে মদীনাবাসীগণ রাসূলে করীম স. এবং অন্যান্য মুহাজিরীনকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। তাদের জন্য নিজেদের জান ও মাল পর্যন্ত

১. স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, "স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংগ" কথাটি আমাদের মধ্যে যদিও হাদীস বলে পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী করীম স. এমন কোনো কথা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি।

অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রা. এ কারণেই বলে ছিলেন ঃ "মদীনা কুরআনের দ্বারা জয় করা হয়েছে।" হযরত নবী করীম স. আনসার ও মুহাজিরীনকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। আর তাঁরাও এমন গভীর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, দীর্ঘকাল যাবত একে অপরের উত্তরাধিকার (মীরাস) পেয়ে আসছিলেন। অতপর আল্লাহকে এ আয়াত নাযিল করেই এ কাজ বন্ধ করেছিলেন ঃ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ মিরাসের ব্যাপারে রক্ত সম্পর্কই বেশি হকদার। আনসারগণ নিজেদের জমি-ক্ষেত আধাআধি ভাগ করে মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। পরে বনী নযীরের ভূমিসমূহ যখন অধিকার করা হয়, তখন এ জমিগুলোকেও মুহাজির ভাইদের দান করার জন্য আনসারগণ নবী করীম স.-এর নিকট দাবী জানিয়েছিলেন। এ আত্মদানের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

"তারা নিজেদের অভাব ও কষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর মুহাজিরদেরকে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছে।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আওফ ও হযরত সায়াদ বিন রবী আনসারী পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অতপর হযরত সায়াদ তাঁর এ দীনী ভাইকে অর্ধেক সম্পত্তি দিলেন এবং তার একাধিক স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তাঁর নিকট বিবাহ দিতে প্রস্তুত হলেন। নবী করীম স.-এর যুগের মুহাজিরগণই যখন ক্রমাগতভাবে খলীফা নিযুক্ত হতে লাগলেন, তখন মদীনার কোনো এক ব্যক্তিও তাদেরকে একথা বলেনি যে, তোমরা বিদেশী লোক, আমাদের দেশে কর্তৃত্ব করার তোমাদের কি অধিকার আছে। রাসূলে করীম স. এবং হযরত উমর ফারুক রা. মদীনার অদূরে মুহাজিরদেরকে ভূমি দান করেছিলেন ; কিন্তু কোনো আনসার সে সম্পর্কে 'টু' শব্দ পর্যন্ত করেননি।

ইসলামী সম্পর্ক রক্ষার জন্য পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ

অতপর বদর ও ওহুদ যুদ্ধে মক্কার মুহাজিরগণ দীন ইসলামের জন্য নিজেদেরই আত্মীয় বান্ধবদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছেন। হযরত আবু বকর রা. স্বয়ং তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের উপর তরবারির আঘাত হেনেছিলেন, হযরত হুযাইফা নিজের পিতা আবু হুযাইফার উপর আক্রমণ করেছিলেন, হযরত উমর রা. তাঁর মামাকে হত্যা করেছিলেন, স্বয়ং নবী করীম স.-এর পিতৃব্য আব্বাস চাচাতো ভাই আকীল, জামাতা

আবুল আছ বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে এবং তাদেরকেও সাধারণ কয়েদীদের ন্যায় রাখা হয়। হযরত উমর রা. প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমগ্র যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হোক এবং প্রত্যেকেই নিজের নিকটাত্মীয় বন্দীকে হত্যা করুক।

মক্কা বিজয়কালে রাসূলে করীম স. অনাত্মীয় বৈদেশিক লোকদের সহযোগিতায় নিজ গোত্র এবং আপন জন্মভূমি আক্রমণ করেছিলেন। অপরের দ্বারা আপন লোকদের গর্দান কেটেছিলেন। আরবের কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার গোত্র বহির্ভূত লোকদের নিয়ে নিজ গোত্র-গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করা—তাও আবার কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা সম্পদ বা সম্পত্তি দখল করার জন্য নয়, কেবলমাত্র একটি কালেমাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরবের ইতিহাসে বাস্তবিকই অপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা। কুরাইশ বংশের বদমাশ যুবক দল যখন নিহত হচ্ছিল, তখন আবু সুফিয়ান এসে বলেছিল ঃ "হে রাসূলুল্লাহ! কুরাইশ বংশের কচি সন্তান সব নিহত হচ্ছে, ফলে কুরাইশ বংশের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে।" রাহমাতুল্লিল আলামীন স. মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা দান করলেন। এতে আনসারগণ মনে করলেন যে, হযরত স.-এর মন হয়ত তাঁর জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তাঁরা বললেন ঃ "হযরত স. মানুষ বই আর কিছুতো নন, শেষ পর্যন্ত নিজ বংশের আভিজাত্য সুরক্ষিত না করে পারলেন না।" নবী করীম স. একথার সংবাদ পেয়ে আনসারদের সমবেত করলেন এবং বললেন ঃ বংশ বা স্বগোত্রের প্রেম আমাকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট বা বিচলিত করতে পারেনি ; আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আল্লাহরই জন্য হিজরাত করে তোমাদের নিকট গিয়েছি। এখন আমার জীবন ও মৃত্যু তোমাদের সাথেই জড়িত।" এখানে নবী করীম স. যা কিছু বলেছিলেন জীবনের প্রতিটি কাজ দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। যে কারণে মক্কা থেকে তিনি হিজরত করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের পর তার কোনো একটি কারণও অবশিষ্ট ছিল না ; কিন্তু তবুও তিনি মক্কায় বসবাস করেননি। এটা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলে করীম স. কোনো স্বাদেশিক কিংবা প্রতিশোধমূলক ভাবধারার বশবর্তী হয়ে মক্কা আক্রমণ করেননি ; করেছিলেন কেবলমাত্র সত্যের মহান বাণীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য।

পরবর্তীকালে যখন হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের ধন-সম্পদ হস্তগত হয়েছিল, তখনও অনুরূপ ভুল ধারণার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। নবী করীম স. গনীমাতের মাল থেকে কুরাইশ বংশের নওমুসলিমদেরকে বেশি অংশ দান করেছিলেন। কোনো কোনো যুবক আনসার এটাকে জাতীয় পক্ষপাতিত্ব বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। তারা একটু ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে বলেছিল

যে, আল্লাহ্ রাসূলে করীম স.-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশদের দিয়েছেন আর আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন। যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত টপ টপ করে ঝরছে। এটা শুনে নবী করীম স. আবার তাদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ এরা নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলেই এদেরকে বেশি দান করছি। তাদের মন রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এরা পার্থিব সম্পদ নিবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে পাবে। এ 'বণ্টন' কি তোমরা পসন্দ করো না ?

বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একজন গিফার বংশের ও একজন আওফ বংশের লোকের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। গিফার বংশের লোকটি আওফ বংশের লোকটিকে চপেটাঘাত করে। আওফ বংশ আনসারদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে তারা আনসারদেরকে গিফারীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাল। অপরদিকে গিফার বংশ মুহাজিরদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এজন্য গিফারীগণ মুহাজিরদের নিকট মুকাবিলার জন্য সাহায্য দাবী করেন। উভয় পক্ষের শাণিত তরবারি কোষমুক্ত হবার উপক্রম হয়। নবী করীম স. এ সংবাদ পেয়ে উভয় পক্ষকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ "তোমাদের মুখে আজ এ কি জাহেলিয়াতের শব্দ ধ্বনিত হলো ?" তারা বললো ঃ "একজন মুহাজির একজন আনসার ব্যক্তিকে মেরেছে ?" নবী করীম স. বললেন ঃ "তোমরা এ অন্ধকার বর্বর যুগের কথাবার্তা পরিত্যাগ কর, এটা বড়ই ঘৃণিত ব্যাপার।"

এ যুদ্ধে মদীনার প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইও যোগ দিয়েছিল। সে এ ঘটনা শুনতে পেয়ে বললো ঃ "এরা আমাদের দেশে এসেই 'ফুলে ফলে বিকশিত' হয়েছে, আর এখন আমাদেরই মাথায় চড়ছে। একটি কুকুরকে পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করার পর সে যদি প্রতিপালককেই দংশন করে, তবে সেই অবস্থাকে আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আল্লাহর শপথ, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর আমাদের মধ্যে সম্মানিত ও শক্তিশালী দল দুর্বল ও লাঞ্ছিত দলকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিবে।"

অতপর আনসারদের লক্ষ্য করে সে বললো ঃ "তোমাদেরই বা কি হলো ? তোমরাই ঐ লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ, ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছ। আল্লাহর শপথ, তোমরাই যদি এদের পরিত্যাগ করো তবে এরা বায়ু সেবন করেই জীবন ধারণ করতে বাধ্য হবে।" নবী করীম স. যখন এসব কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইর ছেলে

হযরত আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন যে, "তোমার পিতা একথা বলছে।" হযরত আবদুল্লাহ পিতাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতেন এবং খাযরাজ বংশের কোন পুত্রই পিতাকে এতখানি ভালবাসে না বলে তিনি গৌরববোধ করতেন। কিন্তু একথা শুনে তিনি বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আদেশ করলে এখনি তার মস্তক কেটে আনবো।" কিন্তু নবী করীম স. নেতিবাচক উত্তর দিলেন। যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত আবদুল্লাহ পিতার উপর তরবারি উত্তোলন করে বললেন ঃ "হযরতের অনুমতি না হলে তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। তুমি নাকি বলেছ যে, আমাদের মধ্যে সম্মানিত দল লাঞ্ছিত লোকদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিবে ? তবে তুমি জেনে রাখ, যাবতীয় সম্মান কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই সংরক্ষিত।" ইবনে উবাই একথা শুনে চিৎকার করে উঠলো এবং বললো, "খাযরাজগণ শোন, আমার পুত্রই এখন আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।" লোকজন এসে হযরত আবদুল্লাহকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "হযরতের অনুমতি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে কিছুতেই মদীনায় প্রবেশ করতে দিব না।" শেষ পর্যন্ত হযরতের নিকট থেকে যখন অনুমতি আসলো, তখন তা শুনে হযরত আবদুল্লাহ তরবারি কোষবদ্ধ করলেন এবং বললেনঃ "নবী করীম স.-এর যখন অনুমতি হয়েছে, তখন আমার কোনো আপত্তি নেই।"[১]

বনু কায়নুকার উপর যখন আক্রমণ করা হয়, তখন হযরত উবাদা বিন সামেতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা করার জন্য 'সালিশ' নিযুক্ত করা হলো। তিনি গোটা গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করার ফায়সালা করলেন। এরা হযরত উবাদার গোত্র খাযরাজের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি এর বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না। বনু কুরাইযার ব্যাপারেও অনুরূপভাবে আওস নেতা হযরত সায়াদ বিন মায়াযকে 'বিচারক' মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি ফায়সালা করলেন যে, বনু কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করে রাখতে হবে এবং তাদের ধন-সম্পত্তি 'গনীমত' হিসাবে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে তিনি আওস ও বনু কুরাইযার মধ্যে যুগান্তকালের সন্ধি-চুক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল করলেন না। অথচ এটা সর্বজনবিদিত যে, আরব দেশে পারস্পরিক চুক্তির অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। উপরন্তু শত শত বছর ধরে এরা আনসারদের সাথে একত্রে ও একই দেশে বসবাস করছিল। কিন্তু তা সবই ব্যর্থ হলো।

---

১. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাফসীর ইবনে জারীর-এর ২৮ খণ্ড, ৬৬-৭০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইসলামী জাতি গঠনের মৌলিক প্রাণসত্ত্বা

এসব ঐতিহাসিক প্রমাণ ও তথ্য থেকে এ সত্যই পরিস্ফুট হচ্ছে যে, ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে বংশ, গোত্র, ভাষা ও বর্ণের কিছুমাত্র গুরুত্ব নেই। যে নির্মাতা এ 'প্রাসাদ' নির্মাণ করেছেন, তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব-অতুলনীয়। তিনি সমগ্র মনুষ্য জগতের 'কাঁচামাল' সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে দেখেছেন। বেছে বেছে উত্তম ও উৎকৃষ্ট মাল-মসলা যা পাওয়া গেছে, তা সংগ্রহ করেছেন। ঈমান ও সৎকাজ পোখ্‌ত ও নিখুঁত ছিল বলে এসব বিভিন্ন উপাদানকে একত্রে সমন্বিত করেছেন এবং এক বিশ্বব্যাপক ও নিখিল সৃষ্টিলোকব্যাপী এ জাতীয়তার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এ বিরাট ও মহান প্রাসাদের স্থিতি ও স্থায়িত্ব শুধু একটি কাজের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। তা এই যে, তার মূল আকৃতি ও স্থানের দিক দিয়ে বিভিন্ন 'অংশ' নিজেদের স্বতন্ত্র মৌলিকতার কথা ভুলে একটি মাত্র 'মূলকেই' গ্রহণ করবে ও স্মরণে রাখবে ; নিজেদের বিভিন্ন বর্ণ ভুলে একটি মাত্র বর্ণে ভূষিত হবে। স্থান ও ভূমি নির্বিশেষে সকলে একই 'মুক্তিকেন্দ্র' থেকে নির্গত হবে এবং একই 'সত্য মঞ্জিলে' উপস্থিত হবে। সীসা ঢেলে তৈরি করা এ প্রাচীরই জাতীয় ঐক্যের মূলকথা। এ ঐক্য যদি চূর্ণ হয়, জাতির মৌলিক উপকরণসমূহে যদি নিজেদের মূল বংশের আলাদা আলাদা হওয়ার, নিজেদের জন্মভূমি ও বাসস্থানের বিভিন্ন হওয়ার এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের পরস্পর বিরোধী হওয়ার অনুভূতি তীব্রভাবে জেগে উঠে, তাহলে এ ইমারতের প্রাচীরে ফাটল ধরে তার বুনিয়াদ চূর্ণ হওয়া এবং তার সমগ্র মৌলিক উপকরণ ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন বহু রাষ্ট্র গড়া যায় না, ঠিক তেমনি একই জাতীয়তার মধ্যে একাধিক জাতীয়তা স্থান পেতে পারে না। ইসলামী জাতীয়তার মধ্যে বংশীয়, গোত্রীয়, স্বাদেশিক, ভাষা এবং বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার সমাবেশ হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এ উভয় জাতীয়তার মধ্যে একটি মাত্র জাতীয়তাই টিকতে পারে—বেশি নয়।

অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, মুসলমান হয়ে থাকা ও বাস করাই যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তাকে দুনিয়ার অন্যান্য সকল প্রকার জাতীয়তার অনুভূতিকে বাতিল মনে করতে হবে, মাটি এবং রক্তের সকল প্রকার সম্পর্ক-সম্বন্ধকে ছিন্ন ও অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু তবুও যদি কেউ ঐসব সম্পর্ক অবিকৃত ও পূর্বের ন্যায় স্থায়ী করে রাখতে চায়, তবে তার হৃদয়, মন ও মস্তিষ্কে ইসলাম যে প্রবেশ লাভ করেনি, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। বস্তুত এমন ব্যক্তির মন ও মগজের উপর চরম জাহেলিয়াত আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কাজেই আজ না হলেও কাল সে অবশ্যই ইসলাম ত্যাগ করবে এবং ইসলামও তাকে ত্যাগ করবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

শেষ নবীর শেষ উপদেশ

মুসলমানদের মধ্যে এ প্রাচীন জাহেলী হিংসা-দ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ যাতে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে এবং তার কারণে ইসলামের জাতীয় প্রাসাদের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে না যায়, এটাই ছিল নবী করীম স.-এর শেষকালের সর্বাপেক্ষা বড় আশংকা। এজন্যই তিনি বারবার বলতেন ঃ

لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - بخارى كتاب الفتن -

"আমার পরে তোমরা যেন পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত না হও এবং তার পরিণামে তোমরা যেন পরস্পরকে হত্যা করতে উদ্যত না হও।"

নবী করীম স. জীবনের শেষ হজ্জে—বিদায় হজ্জ উপলক্ষে আরাফাতের ময়দানে বিরাট মুসলিম জনসম্মেলনে বক্তৃতা করে বলেন ঃ

"জেনে রাখ! জাহেলী যুগের সমস্ত বস্তুই আমার এ দু পায়ের নীচে! আরবকে অনারবের উপর এবং অনারবকে আরবের উপর কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি। মুসলমান মুসলমানের ভাই—মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। জাহেলী যুগের সকল প্রকার মতবাদ বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইয্যত এবং তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের পক্ষে ঠিক তদ্রূপ হারাম, যেমন আজিকার এ হজ্জের দিন তোমাদের এ মাস ও এ শহরে হারাম—সম্মানিত।"

অতপর 'মিনা' নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে এটা অপেক্ষাও অত্যন্ত জোরালো ভাষায় পুনরায় এ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তখন তিনি এটাও বলেছেন ঃ

"শোন, আমার পরে তোমরা পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ে পরস্পরে হত্যা কাজে লিপ্ত হবে না। অতি শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্মের হিসাব নেয়া হবে।"

"শুনে রাখ, কোনো নাকবোঁচা নিগ্রোকেও যদি তোমাদের 'রাষ্ট্রকর্তা' নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে।"

একথা বলে তিনি সমবেত জনসমুদ্রকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আমি কি তোমাদের নিকট এ বাণী পৌঁছে দিয়েছি ? জনসমুদ্র উত্তরে বলে উঠলো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।" তখন নবী করীম স. বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থেকো।" সমবেত লোকদেরও তিনি বললেন ঃ "উপস্থিত লোকেরা আমার এ বাণী যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়।"

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ওহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের স্থানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ

"আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে, সে আশংকা আমার নেই। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার লালসায় লিপ্ত হও নাকি, তাই ভাবনার বিষয়। পরস্পর লড়াই করতে শুরু করো না। তা করলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন প্রাচীন জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে।"

ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ

বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহামানব যে বিপদের আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, বস্তুতই তা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলাম এবং মুসলমানের উপর যেসব সর্বগ্রাসী বিপদ আবর্তিত হয়েছে, তা সবই এর কারণে সম্ভব হয়েছে। নবী করীম স.-এর ইন্তেকালের কয়েক বছর পরই হাশেমী বংশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উমাইয়া গোত্রের হিংসা ও আভিজাত্যবোধের উন্মত্ত ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা ইসলামের প্রকৃত রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চিরতরে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। অতপর তাই আবার আরবী, আযমী ও তুর্কী জাতি-বিদ্বেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করলো এবং ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে ধ্বংস করলো। এরপর বিভিন্ন দেশে যেসব 'মুসলিম রাষ্ট্র' স্থাপিত হয়েছিল, সে সবের ধ্বংসপ্রাপ্তির মূলেও এ ফেতনার তীব্র প্রভাব বিদ্যমান ছিল। নিকট অতীতকালে ভারতবর্ষে এবং তুরস্কে দুটি মুসলিম রাষ্ট্র খুবই বিশাল-বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এ ফেতনা সে দুটিকেও ধ্বংস করেছে। ভারতবর্ষে মোগল ও ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য, মোগল রাষ্ট্রের বুনিয়াদ চূর্ণ করেছে এবং তুর্কীরাষ্ট্র তুর্ক, আরব ও কুর্দিদের পারস্পরিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পড়ে দেখুন, যেখানেই কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র পরিলক্ষিত হবে, তারই বুনিয়াদে জাতি-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে অসংখ্য বিভিন্ন বংশের এবং বিভিন্ন জাতির রক্ত ধারার ত্রিবেনী সংগম ঘটেছে— দেখতে পাবেন, তারা রাষ্ট্রনেতা, সেনাধ্যক্ষ, লেখক-চিন্তাবিদ এবং যোদ্ধা সকলেই বিভিন্ন জাতি সমুদ্ভূত হবে। ইরাকবাসীকে আফ্রিকায়, সিরিয়ানকে ইরানে, আফগানকে ভারতে (ভারতীয়কে পাকিস্তানে) অত্যন্ত সাহসিকতা,

বিশ্বস্ততা, সততা ও নির্ভীকতা সহকারে মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত দেখতে পাবেন। আর তাদের এ খেদমত বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রের খেদমত নয়, একান্তভাবে নিজের দেশ হিসাবেই তাঁরা এটা করছেন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বীর কর্মাধ্যক্ষ সংগ্রহ করার ব্যাপারে বিশেষ কোনো দেশ, বিশেষ কোনো গোত্র কিংবা জাতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেনি। যেখানেই প্রতিভাসম্পন্ন মস্তিষ্ক এবং বলিষ্ঠ, দক্ষ ও নিপুণ হস্ত হয়ে গেছে, সেখান থেকেই তাদেরকে একত্র করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেক দারুল ইসলামকেই নিজের দেশ এবং আপন ঘর মনে করেছেন। কিন্তু অহমিকতা, স্বার্থপরতা ও জাতি-বিদ্বেষের সর্বগ্রাসী ফেতনা যখন উঠলো, মুসলমানদের মধ্যে জন্মভূমি, বর্ণ ও বংশের বৈষম্য যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো, তখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে শুরু করলো। দলাদলি, আত্মকলহ এবং কুটিল ষড়যন্ত্রের সয়লাব বইতে লাগলো। যে শক্তি একদা দুশমনদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তাই এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে শাণিত হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল। মুসলমানদের মধ্যে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং বড় বড় মুসলিম শক্তিসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ

বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করে, তাদের অন্ধ অনুকরণ করে দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমানই বংশ বা গোত্রবাদ এবং স্বাদেশিকতার মহিমা গাইতে শুরু করেছে। আরব দেশ আজ আরব জাতীয়তার জন্য গৌরব করছে, মিশরবাসী আজ বহু প্রাচীনকালের স্বৈরাচারী ফিরাউনকে জাতীয় নায়ক হিসাবে স্মরণ করছে। তুরস্কবাসী তুর্কীবাদের উত্তেজনায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ চেংগীজ ও হালাকুখানের সাথে নিজেদের নিকটতম গভীর আত্মীয়তা অনুভব করছে। ইরানবাসীগণ আজ ইরানী আভিজাত্যবোধের তীব্রতায় দিশাহারা। তাদের মতে আরব সাম্রাজ্যবাদের দৌলতেই হুসাইন ও আলী রা.-এর মত লোক জাতীয় 'হিরো' হতে পেরেছেন, অন্যথায় রুস্তম ও এস্ফানদিয়ারই প্রকৃতপক্ষে তাদের জাতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি। বিভাগপূর্ব ভারতেও বহু মুসলমান নিজেদেরকে ভারতীয় জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছে, অনেক লোক আবে যমযমের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে 'গংগার জলের' সাথে নিজেদের জাতীয় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভীম এবং অর্জনুকে জাতীয় 'হিরো' মনে করেছে। কিন্তু এর কারণ কি ? এ মারাত্মক অবস্থার একমাত্র কারণ হচ্ছে এসব অজ্ঞ-মূর্খগণ যেমন নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুনকে মোটেই অনুধাবন করতে পারেনি, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য তাহযীবকেও নয়। মূলনীতি এবং নিগূঢ় সত্য তাদের গোচরীভূত হয়নি। তারা অত্যন্ত স্থূলদর্শী বলে বাহ্যিক চাকচিক্যময় ও চিত্তহারী চিত্র দেখে মুগ্ধ

হয়—তার জন্য পাগল হয়ে উঠে। তারা মাত্রই বুঝতে পারে না যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তার জন্য যা সঞ্জীবনী সুধা, ইসলামী জাতীয়তার জন্য তাই মারাত্মক হলাহল। পাশ্চাত্য জাতীয়তার ভিত্তি বংশ, দেশ, ভাষা ও বর্ণের ঐক্যের উপর স্থাপিত। এ জন্য যে ব্যক্তি তার স্বজাতিভুক্ত ও একই বংশোদ্ভূত এবং একই ভাষাভাষী নয়—সে যদি তার সীমান্তের এক মাইল দূরেও অবস্থিত হয়, তবুও তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখতে বাধ্য হয়। সে দেশে এক জাতির লোক অন্য জাতির প্রকৃত ও একনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে না, এক দেশের অধিবাসী অন্যদেশের প্রকৃত খাদেম হতে পারে না। এক জাতি অন্য জাতির কোনো ব্যক্তির প্রতি এতটুকু আস্থা রাখতে পারে না যে, সে তার নিজ জাতির স্বার্থকে বাদ দিয়ে তার স্বার্থকে বড় করে দেখতে পারবে। কিন্তু ইসলামী জাতীয়তার ব্যাপারটি এটা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি বংশ-গোত্র এবং স্বদেশের পরিবর্তে মতবাদ-বিশ্বাস ও কর্মাদেশের উপর স্থাপিত। দুনিয়ার সমগ্র মুসলমান সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্যের উর্ধে থেকে পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং সহযোগী ও সহকর্মী হতে পারে। একজন ভারতীয় (বা বাংলাদেশী) মুসলমান মিশরের ততখানি বন্ধু হতে পারে—অনুগত হতে পারে, যতখানি সে নিজের দেশের বন্ধু ও অনুগত। একজন আফগানি মুসলমান আফগানিস্তান রক্ষার জন্য যতখানি আত্মদান করতে পারে, ঠিক ততখানি পারে সিরিয়া রক্ষার ব্যাপারে। এজন্যই বলছিলাম যে, এক দেশের মুসলমান এবং অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে ভৌগলিক বা বংশীয়-গোত্রীয় কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি এবং পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম-নীতি পরস্পর বিরোধী। সে দেশের জন্য যা শক্তির কারণ, ইসলামের পক্ষে তাতে ভাঙন ও বিপর্যয় ঘটে। পক্ষান্তরে ইসলামের জন্য যা সঞ্জীবক, পাশ্চাত্য জাতীয়তার জন্য তাই হত্যাকারী বিষ। কবি ইকবাল এ তত্ত্বটি কি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

কোনো কোনো লোক এটাই ধারণা করে যে, স্বাদেশিক কিংবা বংশীয় গোত্রীয় জাতীয়তার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার পরও ইসলামী জাতীয়তার সূত্র মুসলমানদেরকে গভীরভাবে বাঁধতে পারে। এজন্য তারা নিজেদেরকে এ বলে ধোঁকা দেয় যে, এ উভয় ধরনের জাতীয়তা একই সাথে চলতে পারে। একের দ্বারা অপরের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। বরং আমরা

উভয় প্রকার জাতীয়তা থেকেই অফুরন্ত সুফল লাভ করতে পারি। কিন্তু এটা যে একেবারেই চরম মূর্খতা এবং বুদ্ধিহীনতারই অনিবার্য ফল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একটি দেহে যেমন দুটি মন স্থান লাভ করতে পারে না, তেমনি একটি মনে দুটি জাতীয়তার পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক ভাবধারার সমন্বয় করাও কিছুতেই সম্ভব নয়। জাতীয়তার অনুভূতি 'আপন' ও 'পরের' মধ্যে অনিবার্যরূপে পার্থক্যের সীমারেখা অংকিত করে। ইসলামী জাতীয়তার অনিবার্য ও দুর্নিবার প্রভাবে একজন মুসলিম বাধ্য হয়েই মুসলমানকে আপন এবং অমুসলিমকে 'পর' বলে মনে করবে। অপরদিকে স্বাদেশিক বা বংশীয় জাতীয়তার অনুভূতির স্বাভাবিক পরিণতিতে আপনার দেশে, নিজের বংশ বা গোত্রের প্রত্যেকটি মানুষকে আপন এবং অন্য দেশের বা অন্য বংশের লোককে পর বলে মনে করবেই। এ উভয় ভাবধারা—উভয় প্রকার অনুভূতিই একই স্থানে সমন্বিত হতে পারে বলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি প্রমাণ করতে পারে? আপনার দেশের অমুসলিমকে আপনও মনে করবেন—'পর'ও মনে করবেন, বিদেশী মুসলমানকে দূরবর্তীও মনে করবেন, আবার নিকটবর্তীও—এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

هَلْ يَجْتَمِعَا مَعًا ؟ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ ؟

অতএব একথা পরিষ্কাররূপে বুঝে নিতে হবে যে, মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয়, তুর্কী, আফগানী, আরবী, ইরানী, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী প্রভৃতি হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হওয়া ইসলামী জাতীয়তার চেতনা এবং ইসলামী ঐক্যবোধের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক এবং ক্ষতিকারক। এটা কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফলই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও এটা বরাবর অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। মুসলমানদের মধ্যে যখন আঞ্চলিক বা বংশীয় জাতীয়তার হিংসা-বিদ্বেষ জাগ্রত হয়েছে, তখনি মুসলমান মুসলমানদের গলায় ছুরি চালিয়েছে, এবং لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে গিয়ে পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না"—নবী করীম স.-এ আশংকাকে বাস্তব করেই ছেড়েছে! কাজেই ইসলামী জাতীয়তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনোরূপ জাতীয়তা—ভৌগলিক, গোত্রীয় বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রচার যদি করতেই হয়, তা ভাল করেই জেনেশুনেই করা আবশ্যক—জেনে নেয়া আবশ্যক যে, এ ধরনের জাতীয়তার মতবাদ শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স. কর্তৃক প্রচারিত জাতীয়তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এ ব্যাপারে নিজেকে প্রবঞ্চিত করে বা অন্য লোকদের প্রতারণা ও গোলক ধাঁধায় দিক ভ্রান্ত করে কোনোই লাভ নেই।

—তরজুমানুল কুরআন ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৩৩ ইং।

ইসলামের মিলনবাণী

(এটা গ্রন্থকারের একটি বক্তৃতা)

মুসলিম জনসাধারণ যেখানে পরস্পর মিলিত হয়—এক আল্লাহর আদেশানুগামী ও এক রাসূলের উম্মাত হওয়ার কারণে যেখানে সমবেত হয়, সে স্থানের দৃশ্য যে কত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও এ প্রকারের দৃশ্য খুবই পসন্দ করে থাকেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○ الصف : ٤

"আল্লাহর পথে যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"—সূরা সফ ঃ ৪

আল্লাহর ভালবাসা লাভ কেবল যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সালাতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সারিবদ্ধ হলেও আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যেতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

"জুমআর দিন সালাতের জন্য ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা কাজকর্ম ও ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণ—সালাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও।"—সূরা জুমুআ ঃ ৯

এখানেই শেষ নয়, সুদূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সীমান্ত পর্যন্ত মুসলমানদের যে অখণ্ড সংহতি বিদ্যমান, এটাও আল্লাহরই অপার অনুগ্রহের সুস্পষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط

"তোমাদের উপর আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর— তোমরা যখন পরস্পরের শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে তোমরা পরস্পরের ভাই হয়েছিলে। মূলত তোমরা এক অগ্নি গহ্বরের তীরে অবস্থিত ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় অখণ্ড সত্তা হিসেবে কিরূপে গঠন করা যেতে পারে, তা বিশেষভাবে ভাবার বিষয়। মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের দেহ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তার জীবন-প্রাণ। নিজস্ব স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়েও কারো সাথে কারো সামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেকের চিন্তাধারা ও মানসিকতা পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু এত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণকে একটি মাত্র সম্পর্কের বাঁধন পরস্পরকে নিকটতর এবং গভীর বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। এ সম্পর্কই তাদেরকে কখনো মসজিদে সমবেত করে—যেখানে ছোট-বড় গরীব-ধনী সকলে একই কাতারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়। এ সম্পর্কই কোনো এক সময় মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সমবেত করে দেয়—যেখানে তারা একটি মাত্র মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য পরস্পর মিলিত হয়ে সাধনা করে—সংগ্রাম করে। এ সম্পর্কের দরুন তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এরই কারণে মুসলমানদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল করে দেয় এবং এটাই তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। কিন্তু এটা কোনো জড় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, বস্তুত এটা একটি 'বাণী' (কালেমা) মাত্র। এ বাণী অসংখ্য মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে বলেই আমি একে মিলন বাণী বলে অভিহিত করেছি।

বলা বাহুল্য, এখানে বাণী বলতে কতকগুলো শব্দকেই বুঝায় না। অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারাই লক্ষ্যণীয়। মতবাদ ও চিন্তাধারা শব্দের পোশাক পরিধান করে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকেও বাণী বলা হয়। এজন্যই যে চিন্তা-মতবাদ অসংখ্য মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে একটি জাতিতে পরিণত করে, তাই মিলনবাণী বলে পরিচিত হতে পারে। তুর্কি বংশোদ্ভূত লোকদেরকে যে মতের ভিত্তিতে এক জাতি রূপে গঠন করা হয়েছে, তা-ও একটি মিলনবাণী বটে, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর অধিবাসীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে চিন্তা বা মতাদর্শ কাজ করছে, তা-ও এক মিলনবাণী। এক ভাষাভাষী লোকদেরকে কিংবা একই বংশ বা গোত্র থেকে উদ্ভূত লোকদেরকে অথবা এক

দেশের অধিবাসীদেরকে 'এক জাতিতে' পরিণত করার জন্য যত চিন্তা এবং মত কাজ করছে, তা সবই মিলনবাণী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মিলনবাণীসমূহ অতীব সীমাবদ্ধ ; নদী, সমুদ্র, পর্বত, ভাষা ও গোত্র প্রভৃতি বাধাসমূহ এর এক একটিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডীবদ্ধ করে দিয়েছে। এর কোনো একটিও সমগ্র বিশ্বমানবের মিলন সৃষ্টি করতে সমর্থ নয় বলে তার কোনোটিই সমগ্র দুনিয়ার মিলনবাণী হতে পারে না।

বস্তুত উল্লেখিত মিলনবাণীসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটিও মুসলমানকে সম্মিলিত করতে পারে না। মুসলমান কেবলমাত্র এক দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণেই তারা পরস্পর মিলিত হয় না। নির্দিষ্ট কোনো এক ভাষায় কথা বলার কারণেও তারা পরস্পর ভাই হয় না। নিছক রক্তের ঐক্যও তাদেরকে সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত করে না। রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যও তাদেরকে একজাতিতে পরিণত করেনি। আরবী ভাষাভাষী কোনো আরব এবং পশতু ভাষাভাষী আফগানও—মুসলমানদের একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত, আলাদা নয়। আবিসিনিয়ার নিগ্রো এবং পোল্যাণ্ডের ফিরিংগী ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদেরকে কেউই বহিষ্কৃত করতে পারে না। এটা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলমানগণ যাকে 'মিলনবাণী' বলে বিশ্বাস করে, পবর্ত-নদী-সমুদ্র, বংশ, গোত্র এবং ভাষা কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থ–এর কোনো একটিও তাকে কোথাও সীমাবদ্ধ করতে পারে না এবং যে 'বাণী' বিশ্বের সমগ্র মানবতাকে একই 'মিলন-কেন্দ্রে' সমবেত ও সম্মিলিত করতে সমর্থ মুসলমানদের নিকট একমাত্র এটাই 'মিলনবাণী' রূপে পরিগৃহীত হতে পারে। এ 'মিলনবাণী' বিস্তৃতি ও সর্বাত্মক ব্যাপকতা লাভ করার পথে কোনো পার্থিব বা বৈষয়িক বস্তুই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এর নিকট কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, পীতাংগ কিংবা শ্যামাঙ্গ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মানুষই সম্পূর্ণরূপে সমান মর্যাদার অধিকারী। মুসলমানদের বাণীর অন্তর্নিহিত প্রশস্ততার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই ; নিখিল বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই এটা একটি মিলন কেন্দ্রে একত্রিত করতে পারে বলে প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে মিলনবাণী। ইসলামের আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগীতে যাঁচাই করলে নিসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, মুসলমানদের মিলনবাণীর ন্যায় অন্তহীন বিশালতা ও ব্যাপকতার গুণসম্পন্ন অন্য কোনো বাণীই পৃথিবীতে বর্তমান নেই।

বিষয়টির সুস্পষ্টতা বিধানের জন্য এখন একটি বিরাট প্রাসাদের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, যার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং দণ্ডায়মান স্তম্ভ সমূহের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান। অন্যদিকে তার ছাদ ও মেঝেও

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অসংখ্য বস্তু ও দ্রব্য এদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি জিনিস এদের সকলের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধন করেছে—তা এই যে, উল্লেখিত প্রত্যেকটি বস্তুই একই প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এগুলোকে তৈরি করা হয়েছে এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারের সুপরিকল্পিত রচনায় এটা নির্মিত হয়েছে। অতএব এ একটি মাত্র বিষয়ই এ অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুকে সম্মিলিত সংযুক্ত এবং সংঘবদ্ধ করে তুলতে পারে। এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বস্তুই বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি। তদ্রূপ দুনিয়ার বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন জন্মভূমি সম্পন্ন অসংখ্য জাতি যদি 'এক জাতি'তে পরিণত হতে চায় তবে তার একটি মাত্র উপায়ই হতে পারে এবং তা এই যে, তারা সকলে মিলে এক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতার প্রতি সন্দেহাতীত ঈমান আনয়ন করবে ও বিশ্বাস স্থাপন করবে।

আবার সেই প্রাচীরের উদাহরণটাই খানিকটা বিশ্লেষণ করা যাক। প্রকৃতপক্ষে তার রং সাদা ; পাণ্ডুরোগ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তাকে হরিৎবর্ণ বলতে পারে কিংবা অন্য যে কোনো বর্ণের চশমা পরে সে তাকে সেই রং-এর বলে অভিহিত করতে পারে। অথবা কোনো ব্যক্তি জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে কৃষ্ণ কিংবা নীল বর্ণেরও বলতে পারে। এভাবে তার প্রকৃত বর্ণকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার জন্য যে কোনো বর্ণ বলে প্রচার করা যেতে পারে। কিন্তু এ সকল প্রচার ও উক্তি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হবে—দুনিয়ার দর্শক সম্মিলিতভাবে তা কিছুতেই স্বীকার বা সমর্থন করবে না। এজন্য যে মিথ্যার ভিত্তিতে কোনো দিনই ঐক্য স্থাপিত হতে পারে না; ঐক্য এবং সংহতি একমাত্র সত্য ও সততার উপরই স্থাপিত হতে পারে। অতএব সমগ্র বিশ্ববাসী একবাক্যে উক্ত প্রাচীরের শ্বেতবর্ণকে স্বীকার করবে। তদ্রূপ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালক সম্পর্কেও ধারণা হতে পারে—হয়েছেও। খোদা দুজন, তিনজন, কিংবা খোদা লক্ষ-কোটি সত্তায় বিভক্ত হয়েছে। এরূপ অনেক ধারণাই মানব সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু নিখিল সৃষ্টির—আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটির অণু-পরমাণু একবাক্যে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, বিশ্বস্রষ্টা মাত্র একজন। অতএব উপরোক্ত উদাহরণ অনুসারে বিশ্বমানুষের মিলন ও ঐক্য একমাত্র একথা—এ বাণীর ভিত্তিতে হতেই পারে। এছাড়া আর যত কথা, যত ধারণা বা মতবাদ ও বাণী রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিচ্ছেদকারী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী—মিলন, ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করার তাদের কোনো একটিরও সাধ্য নেই। ফেরেশতাদের

সম্পর্কেও অনেক প্রকার ধারণার প্রচলন রয়েছে। কেউ তাদের দেবতা মনে করেছে, কেউ সুপারিশকারী, কেউ খোদায়ী কাজের অংশীদার বলেও মত প্রকাশ করছে। এ সকল প্রকার উক্তি ও ধারণার মধ্যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর খাদেম এবং আল্লাহর নির্দেশের একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত জাতি বলে ধারণা করাই হচ্ছে একমাত্র সত্য ধারণা। দুনিয়ায় ঐক্য স্থাপন একমাত্র এ সত্য বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্ভব। এছাড়া অন্যান্য সব ধারণা-বিশ্বাসই বিভেদ সৃষ্টিকারী, তাতে সন্দেহ নেই।

দুনিয়ায় আল্লাহ প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও গ্রন্থাবলী সম্পর্কেও একথাই সত্য। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় 'নেতা' এবং জাতীয় ধর্মগ্রন্থ নিয়ে স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা করতে পারে এবং নিজ নিজ নেতার সত্যতা ও অপর নেতার মিথ্যা হওয়ার দাবীও করতে পারে। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন উক্তি দুনিয়ার জাতিসমূহকে একই কেন্দ্রে মিলিত করতে পারে না। সকল জাতিকে যুক্ত করে একটি মাত্র জাতি গঠনের ভিত্তিবাণী কেবলমাত্র এ হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার যত নবী-পয়গাম্বর বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই সত্য ; আল্লাহর যত কিতাবই মানুষের প্রতি নাযিল হয়েছে, তা সবই সত্য ও সত্যের শিক্ষাদাতা।

সৃষ্টিজগতের লয় ও মানবজাতির পরিসমাপ্তি সম্পর্কেও বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী মন কেবল একথাই মেনে নিতে পারে যে, নিখিল মানুষকে একদিন 'শেষ জবাবের' জন্য সৃষ্টিকর্তার সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজ নিজ জীবনব্যাপী কাজকর্মের পুংখানুপুংখ হিসেব পেশ করতে হবে।

অতএব বিশ্বব্যাপী ঐক্য ও সংহতি স্থাপন একমাত্র চূড়ান্ত কথা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্ভব। এছাড়া আর যত মত ও পথ রয়েছে, তা সবই ভুল—সবই বিচ্ছেদ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী, এটা নিসন্দেহ।

বস্তুত এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি সংশয়ের লেশহীন বিশ্বাস স্থাপনের নামই হচ্ছে 'মিলনবাণী' ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ط وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ البقرة : ٢٨٥

"রাসূলের প্রতি তাঁর আল্লাহর নিকট থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন। অন্যান্য মু'মিনগণও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, গ্রন্থাবলী এবং তাঁর নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং বলেছে যে, আমরা তাঁর নবীদের পরস্পরের মধ্যে কোনোরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করি না। আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমাদের সকলকে তোমার নিকট ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫

এ পাঁচটি বুনিয়াদী সত্য কথা প্রকাশ করেছেন আল্লাহ তা'আলা। দুনিয়ায় মানুষের নিকট তা প্রচার করেছেন আল্লাহর রাসূল। এজন্য এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনাকে এ একটি মাত্র কালেমা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' মধ্যে একত্রীভূত করে দিয়েছেন। আল্লাহর একত্বের সাথে সাথে হযরত মুহাম্মাদ স.-এর নবুওয়াতের কথা স্বীকার করার অর্থ এই যে, এ কালেমা যিনি পাঠ করলেন, তিনি হযরতের প্রচারিত সমগ্র সত্যের প্রতি ঈমান এনেছেন। .... এ কালেমাকেই খুব ভারী এবং বিরাট জিনিস বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ـ المزمل : ٥

"আমরা তোমার উপর এক দুর্বহ কালাম নাযিল করবো।"–মুযযাম্মিল ঃ ৫

এ বাণী কোনো ছিন্নপত্র বা কাগজের টুকরার মত গুরুত্বহীন নয়—যাকে যে কোনো দমকা হাওয়া উড়িয়ে দিতে পারে। যার একস্থানে কোনো স্থিতি নেই, যা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কার ও দৃষ্টিকোণের প্রবল ধাক্কায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। বস্তুত 'কালেমায়ে তাইয়েবা' এরূপ কোনো বাণী নয়। মূলত এটা পর্বতের ন্যায় বিরাট, গম্ভীর ও সুদৃঢ়। ঝড়-তুফানের কোনো আঘাত—কোনো মহাপ্লাবনও এটাকে কিছুমাত্র টলাতে পারে না। এ অটল-অনড় বিপ্লবী 'মিলনবাণী' সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ

الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ لا وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ○ ابرهيم : ٢٧

"আল্লাহ্ তা'আলা ভাল কালেমার কিরূপ উদাহরণ দিয়েছেন, তা ভেবে দেখেছ কি ? বস্তুত তা এমন একটি সৎ জাতের বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় মাটির গভীর তলদেশে খুব দৃঢ় হয়ে আছে এবং যার শাখা-প্রশাখা উর্ধাকাশে বিস্তৃত। এটা সবসময় তার আল্লাহ্র অনুমতি ও নির্দেশক্রমে ফল দান করে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে এরূপ উদাহরণ এজন্য পেশ করেছেন যে, তারা যেন এটা হতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে নাপাক কালেমার তুলনা করা হয়েছে একটি নিকৃষ্ট জাতের গাছের সাথে। একে মাটির উপরিভাগ থেকেই উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করা হয়। মূলত তার বিন্দুমাত্র স্থিতি নেই। আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদেরকে এ সুপ্রমাণিত সত্য বাণীর দৌলতে স্থিতি দান করবেন—দুনিয়া এবং পরকালে সর্বত্র। যেসব যালেম এ 'সত্যবাণী' অস্বীকার করবে, তারা পথভ্রষ্ট হবে। মূলত আল্লাহ্ তাআলার যা ইচ্ছা হয়, তাই তিনি করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭

কুরআনে উল্লেখিত এ উদাহরণ আলোচ্য বিষয়টিকে খুবই সুস্পষ্ট করে তুলেছে। একমাত্র 'পাক ও পবিত্র এবং সর্বাত্মক বাণী'ই পৃথিবীর বুকে স্থিতি, নিরাপত্তা ও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। এছাড়া অন্যান্য সব ভ্রান্ত, অসৎ ও কদর্যপূর্ণ বাণীর পক্ষে স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি লাভ করা সম্ভব নয়। তা মূলহীন পরগাছার সমতুল্য; একদিকে অসংখ্য জমিতে থাকে অন্যদিকে তা নানাভাবে উৎপাটিত হয়। কালের প্রত্যেকটি ঘটনা, সময়ের প্রত্যেকটি আবর্তন একটি নতুন চারাগাছ উদগম করে এবং অতীতের সমস্ত চারাগাছকে উৎপাটিত করে ফেলে। এসব চারাগাছের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার কোনো শক্তি বা যোগ্যতাই বর্তমান নেই ; আর কোনোটিতে যদি কখনো ফল ধরেও তবু তা অত্যন্ত তিক্ত এবং কটু না হয়ে পারে না। বস্তুত এ ধরনের আগাছা-পরগাছার মারাত্মক ফলের কারণেই বর্তমান মানব সমাজ জর্জরিত। এজন্যই আজ কোনো দেশে মিথ্যা প্রচারণার প্রবল তুফানের সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও বিষাক্ত গ্যাস, আর কোথাও প্রলয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও এর কারণে হিংসা-দ্বেষ, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার বীজ উপ্ত হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কথা এখানে আলোচ্য নয়—যাদের অদৃষ্টে আল্লাহর কঠোর শাস্তি লিখিত রয়েছে, তাদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা

তাদের এসব বিষাক্ত ও মারাত্মক 'পরগাছা' নিয়ে পরিতৃপ্তি ও আত্মশ্লাঘা লাভ করলেও করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে এসব থেকে অনেক দূরে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। তাদের নিকট মহান পবিত্র ও সৎকাজের 'বৃক্ষ' বর্তমান রয়েছে, যা আদমের আগমন সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনো উৎপাটিত হয়নি, আর কখনো তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হতেও ত্রুটি করেনি ; এর মূল শিকড়ও গভীর মাটিতে সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত এবং অন্তহীন উর্ধলোকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ; এ 'বৃক্ষ' থেকে চিরদিন ও সর্বত্রই কেবল শান্তি ও নিঃসঙ্ক নিরাপত্তার 'ফল' পাওয়া গেছে। এ বৃক্ষ তার শীতল ছায়ার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে এবং তার 'ফল' থেকে উপকৃত হতে কোনো দিনই বাধা দেয়নি। মানুষের গোত্র-বংশ-ভাষা এবং জন্মভূমির কোনো বৈষম্য বা সে সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই এর নেই। পরন্তু যে মানুষই এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে সে বংশ-গৌরব, ভাষার পার্থক্য বর্ণের বৈষম্য এবং জন্মভূমির বিরোধ চিরতরে ভুলে গেছে—নিখিল বিশ্ব তার দৃষ্টিতে একেবারে সমান ও একাকার হয়ে গেছে ; বস্তুত এটাই হলো এ 'বৃক্ষের' অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। নিম্নোক্ত শিক্ষাই তার মূল ভাবধারা ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز ـ الفتح : ٢٩

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ 'কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি নম্র ও বিনয়ী। তোমরা তাদেরকে রুকূ' ও সিজদায় কিংবা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী ও সন্তোষের সন্ধানে আত্ম-নিমগ্ন দেখতে পাবে।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯

বস্তুত সমগ্র বিশ্বমানবকে এক মহান সত্যের বিশাল কেন্দ্রে সমবেত করার জন্য এবং অসংখ্য আর্থিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধ সত্ত্বেও এক সর্বসম্মত বিষয়ে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে মিলিত করার জন্য—অন্য কথায় সকল আদম সন্তানকে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এ 'বাণী' মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছিল। ইসলামে ঈমানের বিষয়সমূহে এজন্যই এত ব্যাপকতা ও বিশালতার অবকাশ রক্ষিত হয়েছে। এটা সমগ্র মানব জাতিকে নিজের ক্রোড়ে চিরন্তন আশ্রয় দিতে সক্ষম। এজন্যই এ 'বাণী' প্রচারককে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ الاعراف : ١٥٨

"হে মানুষ! আমিই তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"

এজন্যই বলা হয়েছে—এ 'বাণী' যে গ্রহণ করবে তার রক্ত ও সম্মান সম্পূর্ণ 'হারাম'। তাঁকে হত্যাকারী জাহান্নামের চিরন্তন আযাবে নিমজ্জিত হবে এবং তার সম্মানের হানীকারী 'ফাসেক'। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ বিরাট ও অতুলনীয় 'মিলনবাণী'কে আমরা খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছি। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল এবং পরকালে যারা বিশ্বাসস্থাপন করবে—আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী তারা মুসলিম। কিন্তু আমরা এসব কিছুকে উপেক্ষা করে স্বকপোলকল্পিত বহু অকেজো জিনিসকে ঈমান ও কুফরের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছি। এমনকি এ পাঁচটি বিষয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যেও 'কুফরের' অভিশাপ দ্বিধাহীন চিত্তে বন্টন করা হয়েছে। এ সর্বাত্মক 'মিলনবাণী' বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছি যে, আমাদের মূল 'দীন'ই যেন বিভিন্ন হয়ে গেছে। জাতীয়তা, মসজিদ, সালাত—সবকিছুই পৃথক পৃথক ও আলাদা করে নিয়েছি, নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও আমরা ছিন্ন করেছি এবং 'সকল ঈমানদার ভাই ভাই' বলে আমাদের মধ্যে যে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা হয়েছিল, আমরা তা-ও চূর্ণ করেছি। অতঃপর আমরা একটি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলাম। আমাদের জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত মূলনীতি পরিহার করে অন্যান্য জাতির নিকট থেকে আঞ্চলিক ও বংশীয় জাতীয়তার নতুন শিক্ষা গ্রহণ করেছি—অথচ এটা মূলতঃই ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাহেলী যুগের যেসব হিংসা-দ্বেষ, অন্ধত্ব, স্বজনপ্রীতি ও পারস্পরিক বিরোধ নির্মূল করতে এসেছিল ইসলাম—এক এক করে তা সবই আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। কেউ 'প্যান তুরানিয়ানের' আন্দোলন শুরু করেছেন, কেউ 'প্যান আরবের' ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন—কেউ আর্যবংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নিযুক্ত, কেউ আঞ্চলিক ও জন্মভূমি ভিত্তিক জাতীয়তায় আত্মবিলীন করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এক কথায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল ইসলামের এ অতুলনীয় 'মহামিলন'বাণী চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করছে। অথচ এসব বিবিধ দল ও বিভেদের বাণীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই 'মিলনবাণী' প্রচার করা হয়েছিল।

ছোট-বড় সকল প্রকার মতবিরোধ ও বৈষম্য-পার্থক্যই যে এ 'মিলনবাণী' নিশ্চিহ্ন করবে, এমন কথা আমি বলছি না—বিরোধ ও বৈষম্য মূলত স্বাভাবিক জিনিস; এটা নিশ্চিহ্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্ণ গোত্র ভাষা ও জন্মভূমি-এর কোনো একটির বৈচিত্র্যও নিঃশেষে মিটে যেতে পারে না। চিন্তাশক্তি ও স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরোধ দূর করাও সম্ভব নয়। অতএব এসব বিরোধ ও বৈষম্য মানুষের বিভিন্ন দলের মত ও বিশ্বাস এবং স্বার্থ

ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে প্রকট থাকবে, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের 'মিলনবাণী' প্রেরণের মূলে এসব বৈষয়িক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মতবিরোধের পরস্পরের মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক নৈতিক এবং তামাদ্দুনিক সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করাই উদ্দেশ্য ছিল—যেন সকল মানুষ নির্বিশেষে ও অকুণ্ঠচিত্তে তা গ্রহণ করতে পারে এবং তা কবুল করে সকলেই নিজের ভৌগলিক, গোত্রীয়, অর্থনৈতিক, বর্ণ ও ভাষাগত বৈষম্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র এরই ভিত্তিতে এক জাতিতে পরিণত হতে পারে। এজন্যই এক 'মিলনবাণী' পেশ করার সাথে সাথে তা গ্রহণকারীদের জন্য জামায়াতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করার তাকীদ করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি মাত্র 'কেবলা' নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সাওম এবং হজ্জ ইত্যাদিও সামাজিক বা সমষ্টিগতভাবে আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক ও জাতিগত অন্যান্য সকল প্রকার বিরোধ ও পার্থক্য নির্মূল করা হয়েছে। সমগ্র দুনিয়ার নিখিল মুসলেমীনকে সমান আইনগত মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এবং সকলকে একই সর্বাত্মক ও বিশ্বব্যাপী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দীন ইসলামের ঐক্যের ভিত্তিতে ছোটখাটো অন্যান্য যাবতীয় বিরোধ-ব্যবধান দূরীভূত করে দেয়াই এবং সমগ্র বিশ্বমানবকে এক অভিনব জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের প্রতি আল্লাহর এ বিরাট অনুগ্রহকে সর্বসাধারণ বিশ্বমানবের মধ্যে বিস্তারিত করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই আঞ্চলিক, ভাষাগত, গোত্রীয় এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তার সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ভাবধারা গ্রহণ করেছে। অথচ আধুনিক যুগের ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দেয় যে, বর্তমান পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ, ডিকটেটরবাদ, স্বৈরতন্ত্র এবং যুদ্ধ-সংগ্রাম প্রভৃতি মানবতা বিধ্বংসী বিপর্যয়সমূহ—যা দুনিয়ার শান্তি ও সভ্যতা ধ্বংস করছে এবং ধরিত্রীর বুকে মযলুমের তাজা রক্তের বন্যা প্রবাহিত করছে—এ আধুনিক মত ও দৃষ্টিভংগীরই সৃষ্টি।

কোনো শহর ও জনপদের অদূরে যদি নদীর প্লাবন রোধকারী কোনো বাঁধ থাকে—তবে বাঁধটির সুদৃঢ় ও নিশ্ছিদ্র হওয়ার উপরই এ লোকালয়ের নিরাপত্তা নির্ভর করে, এতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তাতে গভীর ফাটল ধরার সংবাদই যদি লোকেরা শুনতে পায়, তবে তারা যে সেই ফাটল বন্ধ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কিন্তু মানব সমাজে চরম ভাংগন ও বিপর্যয়, হিংসা-দ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতার সর্বগ্রাসী সয়লাব-স্রোতকে যে বাঁধ রুখে দাঁড়িয়ে আছে—যার দৃঢ়তা ও মযবুতীর উপর নিখিল বিশ্বের নিরাপত্তা নির্ভর করে—তাতে আজ কঠিন ফাটল ধরেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মানুষ—বিশেষ

করে মুসলমান সেদিকে মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করছে না—সেজন্য কিছু চিন্তা করছে না—সে জন্য কিছু মাত্র মাথাব্যথাও কারো দেখা যাচ্ছে না। অথচ সত্য কথা এই যে, এ বিরাট মহান বাঁধ সংরক্ষণের জন্য যদি মস্তিষ্কও দান করতে হয়, তবুও তাতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

–তরজুমানুল কুরআন ঃ জুলাই, ১৯৩৪ইং

❒

একজাতিত্ব ও ইসলাম

দারুল উলুম দেওবন্দ-এর প্রিন্সিপাল জনাব মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী 'একজাতিত্ব ও ইসলাম' নামে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম এবং পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত এ পুস্তিকায় জটিল 'জাতিতত্ত্বের' সরল বিশ্লেষণ এবং প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে বলে স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু এটা পাঠ করে আমাদেরকে নির্মমভাবে নিরাশ হতে হয়েছে এবং এ বইখানাকে গ্রন্থকারের পদমর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে হয়েছে। বর্তমান যুগে অসংখ্য ইসলাম বিরোধী মতবাদ ইসলামের মূল তত্ত্বের উপর প্রবল আক্রমণ চালাতে উদ্যত—ইসলাম আজ তার নিজের ঘরেই অসহায়। স্বয়ং মুসলমানগণ দুনিয়ার ঘটনাবলী ও সমস্যাবলী খালেছ ইসলামের দৃষ্টিতে যাচাই করে না ; বলাবাহুল্য—নিছক অজ্ঞানতার দরুনই তারা তা করতে পারছে না। পরন্তু 'জাতীয়তার' ব্যাপারটি এতই জটিল যে, তাকে সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ংগম করার উপরই এক একটি জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। কোনো জাতি যদি নিজ জাতীয়তার ভিত্তিসমূহের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূলনীতির সংমিশ্রণ করে, তবে সে জাতি 'জাতি' হিসাবে দুনিয়ার বুকে বাঁচতে পারে না। এ জটিল বিষয়ে লেখনী ধারণ করতে গিয়ে মাওলানা হুসাইন আহমদের ন্যায় ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তাঁর কাছে নবীর 'আমানত' গচ্ছিত রয়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মূল তত্ত্বের উপর যদি কখনো জঞ্জাল-আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়, তবে এদের ন্যায় লোকদেরই তা দূরীভূত করে ইসলামের শিক্ষাকে সর্বজন সমক্ষে সুস্পষ্ট করে তোলা কর্তব্য।

বর্তমান অন্ধকার যুগে তাঁদের দায়িত্ব যে সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী এবং কঠোর, সে কথা তাদের পুরোপুরিই অনুধাবন করা কর্তব্য ছিল। সাধারণ মুসলমান যদি ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে তবে সে জন্য সর্বপ্রথম এ শ্রেণীর লোকদেরকেই দায়ী করা হবে। সেজন্য আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, মাওলানা মাদানীর এ পুস্তিকায় তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ও দায়িত্বানুভূতির কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি।

অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

একজন গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থে সর্বপ্রথম তাঁর দৃষ্টিকোণেরই সন্ধান করা হয়। কারণ মূল বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং সর্বশেষ কোনো নির্ভুল বা ভ্রান্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়া একমাত্র এ দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে। একটি দৃষ্টিকোণ এই হতে পারে যে, অন্যান্য সকল দিক থেকে দৃষ্টি ফিরায়ে একমাত্র প্রকৃত সত্য ব্যাপার জানতে চেষ্টা করতে হবে, মূল সমস্যাকে তার আসল ও প্রকৃতরূপে দেখতে ও বিচার করতে হবে এবং এরূপ প্রকৃত সত্যের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নিয়ে পৌঁছায়—তা কারো বিরোধী আর কারো অনুকূল, সে বিচার না করেই সরাসরিভাবে তাই গ্রহণ করা কর্তব্য। বস্তুত আলোচনা ও বিশ্লেষণের এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী ; আর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীও এটাই। কারণ এ ব্যাপারে اَلْحُبُّ فِى اللّٰه وَالْبُغْضُ فى اللّٰه। –"আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতাই" হচ্ছে ইসলামের মূলনীতি।

এ সহজ-সরল দৃষ্টিকোণ ছাড়া আরো অনেক কুটিল ও জটিল দৃষ্টিকোণ রয়েছে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির অন্ধ ভালবাসায় মোহিত হয়ে প্রত্যেক কাজে ও ব্যাপারে কেবল তার অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী। অনুরূপভাবে কারো অন্ধ বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে কেবল ঘৃণিত ও ক্ষতিকর জিনিসের সন্ধান করা এবং তা গ্রহণ করাও এক প্রকারের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু এ ধরনের বক্র, কুটিল ও জটিল দৃষ্টিভঙ্গী যতই হোক না কেন, তা সবই প্রকৃত সত্যের বিপরীত হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই তা গ্রহণ করে তার সাহায্যে কোনো আলোচনায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনোই আশা করা যায় না। অতএব এ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে কোনো সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত হওয়া অন্তত একজন আলেম ব্যক্তির কিছুতেই শোভা পায় না। কারণ, এটা সম্পূর্ণত অনৈসলামী দৃষ্টিকোণ।

এখন আমরা যাচাই করে দেখবো যে, মাওলানা মাদানী আলোচ্য পুস্তিকায় উল্লিখিত দৃষ্টিকোণসমূহের মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করেছেন।

পুস্তিকার সূচনাতেই তিনি বলেছেন ঃ

"একজাতিত্বের বিরোধিতা এবং তাকে ন্যায়নীতির বিপরীত প্রমাণ করার প্রসংগে যাকিছু প্রকাশ করা হয়েছে, তার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেয়া এখন জরুরী মনে হচ্ছে। কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ থেকে ভারতবাসীর নিকট স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের দাবী করে

যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা ও সাধনা করছে। তার বিরোধী শক্তিসমূহ তার অ-স্বীকারযোগ্য হওয়া—বরং নাজায়েয ও হারাম হওয়ার কথা প্রমাণ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এটা অপেক্ষা মারাত্মক আর কিছুই নেই। এটা আজ নয়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ কিংবা তারও পূর্ব থেকে এসব কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং বিভিন্নভাবে এর 'ওহী' ভারতবাসীদের মন ও মস্তিষ্ক বৃটিশ কূটনীতিকদের যাদুর প্রভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, তারা একথা কবুল করবে বলে আশা করা যায় না।"–(পৃষ্ঠা ঃ ৫-৬)

এ প্রসংগে ডা. ইকবাল সম্পর্কে বলছেন, "তাঁর ব্যক্তিত্ব কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নয়। কিন্তু এসব গুণপনা সত্ত্বেও তিনি বৃটিশ 'যাদুকর'দের যাদু প্রভাবে পড়ে গেছেন।"

অতপর এক দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ নিম্নলিখিত কথাগুলোর ভিতর দিয়ে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঃ

"ভারতবাসীদের স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে এক জাতিতে পরিণত হওয়া ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, তা অধ্যাপক সীলে'র প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়। ভারতবাসীদের মধ্যে এ ভাবধারা যদি খুব ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে জাগ্রত হয়, তবে তাতে ইংরেজদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করার শক্তি না থাকলেও 'বিদেশী জাতির' সাথে সহযোগিতা করা লজ্জাকর ব্যাপার, এ ভাবটি তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সমাধি হয়ে যাবে।"–(পৃষ্ঠা ঃ ৩৮)

এরপর তিনি এমন একটি আশ্চর্যজনক মত প্রকাশ করেছেন যে, তা পাঠ করলে একজন সুপ্রসিদ্ধ ও আল্লাহভীরু আলেম যে এটা কিরূপে লিখতে পারেন, তা ভাবতেও লজ্জা হয় !

"এক জাতীয়তা যদি এমনিই অভিশপ্ত ও নিকৃষ্ট বস্তু হয়েও থাকে, কিন্তু তবুও ইউরোপীয়গণ যেহেতু এ অস্ত্র প্রয়োগ করেই ইসলামী বাদশাহ ও উসমানী খিলাফতের (?) মূলোচ্ছেদ করেছিল, তাই এ হাতিয়ারকেই বৃটিশের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আজ মুসলমানদের কর্তব্য !–(পৃষ্ঠা ঃ ৩৮)

এ আলোচনা প্রসংগে মাওলানা মাদানী প্রথমত একথা স্বীকার করেছেন যে, "বিগত দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যতদূর ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে, ইসলামী ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের কঠিন ও মারাত্মক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কারণেই তা হয়েছে।" "ইউরোপীয়গণ মুসলমানদের মধ্যে বংশীয়, স্বাদেশিক ও ভাষাগত বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে" তাদের মধ্যে এ ভাবধারাও জাগিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য কোনো জিহাদ করা উচিত নয়, তা করতে হবে বংশ-গোত্র ও জন্মভূমির জন্য। অতএব ধর্মীয় ভাবধারা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।"-(৩৫-৩৬)।

কিন্তু প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের এত নিকটে পৌঁছে তিনি ইংরেজ বিদ্বেষের গোলকধাঁধায় দিগভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "দুঃখের বিষয় মুসলমানদের মধ্যে তখন একজাতিত্ব, স্বাদেশিকতা, বংশ ও গোত্রের বিরুদ্ধে ওয়াজ বর্ণনাকারী কেউই দণ্ডায়মান হয়নি। এমনকি ইউরোপের পত্র-পত্রিকা ও বক্তাদের বক্তৃতার সর্বপ্লাবী বন্যারও প্রতিরোধ করা হয়নি। এর ফলে প্যান-ইসলামবাদ এক অতীত কাহিনীতে পরিণত ও তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং ইসলামী রাজ্যসমূহ ইউরোপীয় জাতিদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এখন মুসলমানদেরকে যখন আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে খণ্ড-বিখণ্ড করে ধ্বংস করেছে, তখন আমাদেরকে বলা হয় যে, কেবল একই মিল্লাতের লোকদের ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব দেয়—এরূপ কোনো অমুস্লিমের সাথে তারা মিলিত ও সংযুক্ত হতে পারে না এবং কোনো অমুসলিমের সাথে মিলিত 'একজাতি'ও গঠন করতে পারে না।"-(পৃষ্ঠা ঃ ৩৬-৩৭)

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ পাঠ করলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায় যে, মাওলানা মাদানীর দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মাপকাঠি হচ্ছে বৃটিশ। তিনি সমস্ত ব্যাপার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখতে চান না যে, প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত সত্যের বাস্তব রূপ কি ! তিনি মুসলমানদের কল্যাণকামী দৃষ্টি থেকেও বিচার করেন না যে, মুসলমানদের জন্য প্রকৃতপক্ষে হলাহল কোন্‌টি ! এ উভয় দৃষ্টিকোণকেই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। শুধু 'বৃটিশ-শত্রুতার' দৃষ্টিকোণই তাঁর উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে। এখন বৃটিশের পক্ষে যে জিনিসটি হলাহল, মাওলানা মাদানী ঠিক সেটিকেই সঞ্জীবনী সুধা মনে করেন। এমতাবস্থায় উক্ত জিনিসকেই যদি কেউ মুসলমানদের জন্যও হলাহল বলে মনে করে এবং এজন্য সে তার বিরোধিতা করে, তবে মাওলানার দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি 'বৃটিশভক্ত' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কারণ বৃটিশের মৃত্যুতে তিনি যতদূর উৎসাহী, মুসলমানদের জীবনলাভের ব্যাপারে তিনি ততটা উৎসাহী নন। এজন্যই

তিনি জানতে পেরেছেন যে, ভারত-বাসীদের 'একজাতিত্ব' বৃটিশের জন্য মারাত্মক ; এখন এ একজাতিত্বের বিরোধী প্রত্যেকটি মানুষই মাওলানা মাদানীর দৃষ্টিতে বৃটিশভক্ত ছাড়া আর কি-ইবা হতে পারে? বৃটিশ ধ্বংসের আর একটি অব্যর্থ পন্থা যদি কেউ মাওলানাকে বলে দিতো ; যদি বলতো, ভারতের ৩৫ কোটি অধিবাসীদের এক সাথে সামগ্রিক আত্মহত্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত সমাধি নিশ্চিত ; আর মাওলানা যদি নোস্খাটির অব্যর্থতা বুঝতে পারতেন, তবে এর বিরোধী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই তিনি বৃটিশভক্ত বলে দোষী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। আত্মহত্যা নিতান্ত নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত কাজ হলেও, এর দ্বারা বৃটিশের মূলোৎপাটন করা সম্ভব বলে, মাওলানার দৃষ্টিতে এ পাপানুষ্ঠান করাও কর্তব্য হয়ে পড়তো।

বস্তুত এ ধরনের কথা ও মতবাদের দৃষ্টিতে 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ক্রোধ'কে ইসলামী সত্যের মানদণ্ড করার যৌক্তিকতা এবং তার নিগূঢ় রহস্য বুঝতে পারা যায়। আল্লাহর সম্পর্ক যদি মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অন্য কোনো বস্তু যদি প্রত্যক্ষভাবে প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে পড়ে, তবে সেখান থেকেই বর্বরতামূলক হিংসা-দ্বেষ শুরু হয়ে যায়। তখন মানুষের প্রেম ও অ-প্রেমের সকল ভাবধারা চরিতার্থ করার অনুকূল সকল উপায় ও পন্থাই হালাল ও সংগত হয়ে পড়ে। মূলত তা আল্লাহর বিধানের অনুকূল কি-না, সে বিচার তখন আদৌ করা হয় না। এজন্যই বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত শত্রুতা শয়তানের সাথেও হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাতেও আল্লাহর সম্পর্ক মাঝখানে থাকা আবশ্যক। অন্যথায় এ শয়তান শত্রুতাই একটি আইনে পরিণত হতে এবং শয়তানের অন্ধ শত্রুতায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন হতে পারে। ফলে শয়তানেরই কাজ করা হবে।

নিজের কথা প্রমাণের জন্য অন্ধ আবেগ

এরূপ মানসিকতার ফলেই মাওলানা মাদানী নিজের দাবী প্রমাণের অন্ধ আবেগে ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ও উজ্জ্বল ঘটনাগুলোকেও উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি। ইউরোপ মুসলমানদের মধ্যে যখন বংশ-গোত্রীয় ; স্বাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা প্রচার করছিল, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে তার প্রতিরোধের জন্য সত্যই কি কেউ দাঁড়াননি? .... টিপু সুলতান, জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু, মোস্তফা কামেল মিশরী, আমীর শাকীব আরসালান, আনোয়ার পাশা, জালাল নুরী, শিবলী নোমানী, সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মাদ আলী, শওকত

আলী, ইকবাল, আবুল কালাম (মরহুম) প্রমুখ কারো নাম কি তিনি শুনতে পাননি ? উক্তরূপ জাতীয়তার জাহেলী বিভেদ মুসলমানদেরকে যে চূর্ণবিচূর্ণ ও ছিন্নভিন্ন করে দিবে—এ বলে কি উল্লেখিত লোকদের মধ্য থেকে কেউই মুসলমানদেরকে সাবধান করেননি ? এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মাদানী হয়ত 'না' বলতে পারবেন না। কিন্তু তবুও তিনি এসব বাস্তব ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরায়ে 'মুসলমানদের একজাতিত্ব সম্পর্কে ওয়াজকারী কেউ দণ্ডায়মান হয়নি' বলেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। .... এরূপ ভ্রান্ত দাবী উত্থাপন করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল ? ...... শুধু একথাই প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃটিশের স্বার্থের বিপরীত, এজন্যই সকল মুসলমান বংশীয়-গোত্রীয়, স্বাদেশিক এবং ভাষাগত বৈষম্য ও বিভেদ বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিল। আর এখন ইসলামিক ঐক্য সংহতি বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল হয়েছে (?) বলে মুসলমানদের জাতীয় ঐক্যের ওয়াজ প্রচার করা শুরু হয়েছে। অতএব প্রমাণ হলো যে, স্বাদেশিকতার বিরোধী প্রত্যেকটি মানুষই বৃটিশভক্ত, বৃটিশের যাদুই তাদের মুখে একথা বলাচ্ছে। বস্তুত এটা জাহেলী বিদ্বেষ রীতিরই পরিণাম, সন্দেহ নেই। সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের মানদণ্ড 'বৃটিশ' হওয়ার কারণে প্রকৃত সত্য ও বাস্তবের বিপরীত কথা রটনা করাও সংগত হতে পারে—যদি তা বৃটিশ স্বার্থের উপর আঘাত হানতে পারে।

মাওলানা মাদানীর গোটা পুস্তিকাতেই এরূপ মানসিতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয়েছে। তাতে অভিধান, কুরআনের আয়াত, হাদীস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ভেঙে-চুরে নিজের মন মতো সাজিয়ে নিজের দাবী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং নিজ দাবীর বিপরীতে প্রত্যেকটি সত্যকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অস্বীকার ও উপেক্ষা করেছেন—তা ভিতর বাইর সবদিক দিয়ে যতবড় সত্যই হোক না কেন। এমনকি শব্দগত ভ্রান্তিবোধের সৃষ্টি করতে, সাদৃশ্যহীন উদাহরণ দিতে এবং ভুলের উপর ভুল মতের ভিত্তি স্থাপন করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। বস্তুত একজন আল্লাহভীরু আলেমের এরূপ কর্মকাণ্ড দেখে লজ্জায় মাথানত হয়ে আসে।

আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে জাতি গঠন কোথায় হয় ?

"বর্তমান সময় জাতি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গঠিত হয়" বলে মাওলানা মাদানী দাবী করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ও প্রতারণাময় এবং আগাগোড়া ভিত্তিহীন। কেবল একটি অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার কারণে কোথাও একটি জাতি গঠিত হয়েছে—মানবতার ইতিহাস থেকে এরূপ

একটি উদাহরণও পেশ করা যেতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ার জাতিসমূহও সকলেরই সামনে বিরাজমান। এদের মধ্যে নিছক আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কোন্ জাতিটি গঠিত হয়েছে? আমেরিকার নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ান ও শ্বেতবর্ণের লোকেরা কি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত? জার্মানীর ইহুদী ও জার্মানরা কি এক জাতি? পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, গ্রীক, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভিয়া, লাথুনিয়া, ভিনল্যাণ্ড—কোথাও কি মাতৃভূমি এক হওয়ার কারণেই 'একজাতি' রয়েছে, কেবল মাতৃভূমির ঐক্যই কি তা সৃষ্টি করেছে? এসব বাস্তব ঘটনা অস্বীকার করা যায় না। আপনি যদি বলতে চান যে, এখন থেকে স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে জাতি গঠন হওয়া উচিত, তবে তা বলতে পারেন। কিন্তু যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া—স্বাদেশিকতা ও মাতৃভূমির ঐক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয়—এরূপ উক্তি করার আপনার কি অধিকার আছে?

একটি দেশের সমগ্র অধিবাসীকে বৈদেশিক লোকগণ সেই দেশের অধিবাসী বলে জানে এবং অভিহিত করে। 'আমেরিকান' বলতে আমেরিকা নামীয় দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীই বুঝায়—সে নিগ্রো হোক কি শ্বেতাঙ্গ; বাইরের লোক তাকে 'আমেরিকান'ই বলবে। কিন্তু মূলত এরা যে দুটি বিভিন্ন জাতির লোক, সে সত্য এতে মিথ্যা হয়ে যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ রাজ্যের 'ন্যাশনাল' বলে পরিচিত হয়, এতে সন্দেহ নেই। যদি মাওলানা হোসাইন আমহদ মাদানী বহির্ভারতে চলে যান, তবে তাঁকে 'বৃটিশ ন্যাশনালিটি' বলে অভিহিত করা হবে। কিন্তু এরূপ পারিভাষিক জাতীয়তা কি মাওলানার প্রকৃত জাতীয়তায় পরিণত হবে। তাহলে "ভারতের অধিবাসী হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও পার্শী সকলেই 'একজাতি' বলে পরিচিত হয়"—একথায় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি কি থাকতে পারে? 'পরিগণিত' হওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে 'একজাতি হওয়ায়' আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। কাজেই এর একটিকে প্রমাণ করার জন্য অন্যটিকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না।

অভিধান ও কুরআন থেকে ভুল প্রমাণ পেশ

অতপর আরবী অভিধান থেকে মাওলানা মাদানী প্রমাণ করছেন যে, 'কওম' শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'পুরুষের দল' কিংবা 'বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমষ্টি' বা 'এক ব্যক্তির নিকটাত্মীয়গণ', 'অথবা শত্রুদের দল'। কুরআনের আয়াত পেশ করেও তিনি এর প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং যেসব আয়াতে কাফেরদেরকে নবী কিংবা মুসলমানদের 'কওম' (জাতি) বলা হয়েছে, তাই তিনি পেশ করেছেন। অথচ এসব আয়াতে জাতি শব্দটি উল্লিখিত চারটি

অর্থের তৃতীয় কি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে 'কওম' (জাতি) শব্দটি থেকে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ পায় তাও তিনি পেশ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জাতি শব্দের আভিধানিক বা প্রাচীন অর্থ সম্পর্কে এখানে কোনোই তর্ক নেই, তর্ক হচ্ছে আধুনিক যুগের পরিভাষা নিয়ে। জওয়াহের লাল এবং সাইয়েদ মাহমুদ আরবী অভিধান এবং কুরআনের ভাষায় কথা বলে না, কংগ্রেসের কর্মসূচিতেও এ প্রাচীন ভাষার ব্যবহার হয় না। তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, যা সেই শব্দসমূহ থেকে বর্তমানে সাধারণত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে 'কওম' ও 'কওমিয়াত' শব্দটি ইংরেজী Nation ও Nationality-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লর্ড ব্রাইস তাঁর "International Relations" গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

> "এক জাতীয়তার অর্থ হচ্ছে অসংখ্য লোকের এমন একটা সমষ্টি, যাদেরকে কয়েকটি বিশেষ উচ্ছ্বাসমূলক আকর্ষণ (Sentiments) পরস্পর মিলিত ও সংহত করেছে। তার মধ্যে দুটি আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—একটি হচ্ছে বংশ বা গোত্রের আকর্ষণ, আর অপরটি হচ্ছে ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার আকর্ষণ। কিন্তু একটি যুক্ত ভাষার ব্যবহার, একই প্রকার সাহিত্য, অতীতকালের সম্মিলিত জাতীয় কার্যকলাপ, সম্মিলিত দুঃখ-কষ্টের স্মরণ, মিলিত উৎসব অনুষ্ঠান, মিলিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং উদ্দেশ্যের অনুভূতিও এ একই সমাবেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হতে পারে। কখনো এসব সম্পর্ক একস্থানে সমন্বিত হলে এটা মানব সমষ্টিকে পরস্পর বিজড়িত করে থাকে। আবার কখনো তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও 'জাতীয়তা'র সৃষ্টি হয়।"-(পৃষ্ঠা ঃ ১১৭)

জাতি বা জাতীয়তার ব্যাখ্যা "Encyclopedia of Religion and Ethics-এ রূপ লিখিত হয়েছে ঃ

> "জাতীয়তা সাধারণ গুণ কিংবা বহুবিধ এমনসব গুণের সৃষ্টি, যা একটি দলের সকল লোকের মধ্যে একইভাবে বর্তমান এবং এটাই তাদের পরস্পর সম্মিলিত করে এক জাতিতে পরিণত করে। .... প্রত্যেকটি সমাজে এমনসব লোক থাকে, যারা বংশ-গোত্র, সম্মিলিত ঐতিহ্য, অভ্যাস ও ভাষার সাদৃশ্যের কারণে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। তারা পরস্পরকে খুব ভাল করে বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে পরস্পর বিজড়িত রাখার এটাই প্রধান সম্পর্ক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। নানা দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতিভাব জন্মে। ভিন্ন জাতির লোকদেরকে তারা আপনা থেকেই 'ভিন্ন' ও অপরিচিত বলে

বুঝতে পারে, কারণ তার রুচি, ভাবভংগী ও অভ্যাস-স্বভাব আশ্চর্য ধরনের মনে হয় এবং তার প্রকৃতি, মতবাদ ও হৃদয় নিহীত উচ্ছ্বসিত ভাবধারা। হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন ও অসুবিধাজনক মনে হয়। এজন্যই প্রাচীন জাতির লোকেরা ভিন্ন জাতির লোকদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। আধুনিক কালের সভ্য ব্যক্তিরাও ভিন্ন জাতির লোকদের অভ্যাস-স্বভাব ও জীবনযাপনের ধারাকে নিজেদের রুচির বিপরীত দেখে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে।"

এ অর্থে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদেরকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য কুরআন মজীদ কি বিন্দুমাত্রও অনুমতি দিয়েছে ? এ অর্থে ঈমানদার ও অঈমানদার সকলকেই এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই দুনিয়াতে কোনো নবী এসেছিলেন কি ? যদি তা না হয় তবে এ অহেতুক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে কেন ? ইতিহাসের আবর্তনের সাথে সাথে শব্দ অসংখ্যবার নিজের অর্থের পরিবর্তন করেছে। একটি শব্দের গতকাল একরূপ অর্থ ছিল, আর আজ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ বিবরণকে উপেক্ষা করে "কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমান ও কাফেরের এক জাতি হওয়া সম্ভব" বলে উক্তি করলে তা শব্দগত বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে ! কারণ কুরআনের ভাষায় 'জাতীয়তা'র যে অর্থ একদিন ছিল, বর্তমানের অর্থের সাথে তার কোনেই সম্পর্ক নেই। পূর্ববর্তী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ 'মাকরূহ' ও 'হারাম' শব্দদ্বয়ে পরিভাষার দিক দিয়ে বিশেষ কোনো পার্থক্য করেননি। এজন্য অনেক স্থানে 'হারাম' অর্থে মাকরূহ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময় এ দু প্রকার নিষেধের মাত্রা বুঝাবার জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা রচিত হয়েছে। এখন 'হারাম'কে 'মাকরূহ' অর্থে ব্যবহার করা এবং প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী লেখকদের কোনো রচনাংশ পেশ করা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি ? জাতীয়তা শব্দটিও বর্তমান সময় এরূপই একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। এখন মুসলমান ও কাফের উভয়ের জন্য 'জাতীয়তা' শব্দ প্রয়োগ করা এবং আপত্তিকারকের মুখ বন্ধ করার জন্য প্রাচীন প্রয়োগকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করায় গোলকধাঁধা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

শাব্দিক বিভ্রান্তি

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মাওলানা দাবি করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে ইহুদী এবং মুসলমানদের মুক্ত জাতীয়তা গঠন করেছিলেন। আর এ দাবির প্রমাণ স্বরূপ তিনি হিজরতের পর নবী করীম স. এবং ইহুদীদের মধ্যে স্থাপিত সন্ধি চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এ চুক্তিপত্রের কোথাও এ বাক্যাংশটি মাওলানার হস্তগত হয়েছে ঃ

وَان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين .

"বনু আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে এক উম্মত বলে পরিগণিত হবে।"

বর্তমান সময়েও মুসলিম এবং অমুসলিমের যুক্ত জাতীয়তা গঠিত হতে পারে—একথা প্রমাণ করার জন্য এ বাক্যাংশকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু এটাতো নিছক একটা শাব্দিক গোলাকধাঁধা। আরবী ভাষায় উম্মত অর্থ এমন একটা দল কোনো কিছু যাকে একত্র করে ; তা স্থান-কাল-ধর্ম বা অন্য কিছুই হোক না কেন। এ বিবেচনায় দুটি ভিন্ন কওম কোনো একটা যৌথ স্বার্থে সাময়িকভাবে একমত হলে তাদেরকেও এক উম্মত বলা যেতে পারে। তাইতো আরবী ভাষার প্রামাণ্য অভিধান 'লিসানুল আরাব' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন ঃ

وَقوله فى الحديث ان يهود بنى عوف امة من المؤمنين يريد انهم بالصلح الذى وقع بينهم وبين المؤمنين كجماعة منهم كلمتهم وايديهم واحدة.

"হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন —বনু আওফের ইহুদী এবং মুসলমানরা মিলে এক উম্মত হবে, একথার মর্ম এই যে, ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে, তারা বলে তারা যেন মুসলমানদেরই একটা দলে পরিণত হয়েছে এবং তাদের ব্যাপার এক ও অভিন্ন।"

উল্লেখিত আভিধানিক শব্দ 'উম্মাত' আধুনিক পরিভাষার 'একজাতিত্ব'-এর সমার্থবোধক কি করে হতে পারে ? খুববেশী হলেও তাকে আধুনিক পরিভাষায় 'সামরিক মৈত্রী (Military Alliance) বলা যেতে পারে। বস্তুত এটা একটি পারস্পরিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম এবং মুসলমানরা নিজেদের জীবনব্যবস্থার অনুসারী থাকবে, উভয়ের তামদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা স্বতন্ত্র থাকবে ; তবে একটি দলের উপর বাইর থেকে কোনোরূপ আক্রমণ হলে উভয় পক্ষই একত্রিত হয়ে তার প্রতিরোধ করবে এবং এ যুদ্ধে নিজ নিজ ধন-সম্পদ খরচ করবে—এটাই হলো উক্ত চুক্তির মূলকথা। দু-তিন বছরের মধ্যেই এ চুক্তির সমাপ্তি হয়েছিল। মুসলমানগণ কিছু সংখ্যক ইহুদীকে নির্বাসিত করেন, কিছু সংখ্যককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। .... এরূপ চুক্তিকে কি কখনো 'একজাতিত্ব' বলা চলে ? বর্তমান

সময় 'একজাতিত্ব' বলতে যা বুঝায়, উল্লেখিত চুক্তিতে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যাবে কি ? মদীনায় কি কোনো যুক্ত জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়েছিল ? কোনো যুক্ত আইন পরিষদ গঠন করা হয়েছিল কি ? 'ইহুদী ও মুসলমানরা' এক সমষ্টিতে পরিণত হবে এবং তার মধ্যে যারা সংখ্যাধিক্য লাভ করবে, তারাই মদীনার শাসনকার্য পরিচালনা করবে, আর তাদেরই মঞ্জুরীকৃত আইন মদীনায় জারী হবে—এরূপ কোনো চুক্তি কি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? কোনো যুক্ত আদালতও কি তথায় কায়েম করা হয়েছিল এবং তাতে ইহুদী ও মুসলমানদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারকার্য একত্রে ও একই দেশীয় আইনের মারফতে সম্পন্ন করা হতো কি ? বস্তুত সেখানে কোনো দেশীয় কংগ্রেস গঠন করা হয়নি এবং ইহুদী সংখ্যাগুরু নির্বাচিত হাইকমাণ্ড ইহুদী ও মুসলমানদেরকে অঙুলি সংকেতে নাচাতো না। দ্বিতীয়ত সেখানে সন্ধিচুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ স. এবং ইহুদী নেতাদের মধ্যে ; কা'ব বিন আশরাফ ও আবদুল্লাহ বিন উবাই সরাসরিভাবে মুসলমান ব্যক্তিদের সাথে 'মাস্‌কন্ট্রাক্ট' (জনংসংযোগ) করতে চেষ্টা করেনি। মুসলমান ও ইহুদী বালকদেরকে এক যুক্ত সমাজের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ওয়ার্ধাস্কীমের ন্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো স্কীমও তথায় রচিত হয়নি। মোটকথা সেই সন্ধিচুক্তি ও বর্তমানের একজাতিত্বের মধ্যে কোনো দূরতম সম্পর্ক এবং সাদৃশ্যও বর্তমান নেই। মাওলানা মাদানী যে 'একজাতিত্ব' আজ হযরত রাসূলে করীম স.-এর প্রতি আরোপ করছেন, তাতে আধুনিক কালের 'একজাতি' গঠনের উপাদানসমূহের কোন্ উপাদানটি বর্তমান পাওয়া যায় ? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কোনো উপাদানই তাতে পাওয়া যেতে পারে না। কাজেই নবী করীম স.-এর চুক্তিতে 'মুসলমানদের সাথে এক উম্মাত' বাক্যাংশটুকু দেখেই মাওলানা মাদানী মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে চান যে, আজ কংগ্রেস যে 'একজাতি' গঠন করতে চেষ্টা করছে, নবী করীম স. স্বয়ং তাই একদিন মদীনায় করেছিলেন। অতএব 'পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততার সাথে বর্তমানের একজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও'—মাওলানা মাদানীর এ প্রচারণা ব্যাপদেশে তাঁর মনে এতটুকু ভয়ও কি জাগ্রত হলো না যে, আল্লাহ তাঁর নিকট এ মিথ্যা প্রচারণার জন্য কৈফিয়ত তলব করতে পারেন ? এটা কি নবী করীম স. সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি নয় ?

মাওলানা মাদানী নিজে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুহাদ্দিস। তাঁর নিকট আমি হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে একটি কথা জিজ্ঞেস

করতে চাই। হাদীসে বলা হয়েছে, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقبل وَمبـاشـر وهو صـــائم. "নবী করীম স. রোযা রেখেও চুমো দিতেন এবং 'মুবাশারাত' করতেন।' এখানে 'মুবাশারাত' শব্দের সাধারণ প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলে রোযা রেখেও 'স্ত্রী সহবাস' করা জায়েয প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাই বলে তার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে এরূপ শরীআত বিরোধী মত হাদীস থেকে বের করা কি সংগত হতে পারে?

এ দুটি যুক্তি সম্পূর্ণরূপে একই ধরনের। কাজেই উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ নীতির ব্যাপারে কোনোরূপ তারতম্য করা যায় না। বিশেষত যুক্তি প্রদাতা যদি জনগণের আস্থাভাজন হন এবং জনগণ তাঁর নিকট থেকে হেদায়াত লাভ করতে চায়, তবে ব্যাপারটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যদি বিষ বণ্টন করা হয়, তবে মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?

ভুল প্রমাণের উপর ভুল মতের ভিত্তি স্থাপন

সমগ্র ভারতবাসীর 'একজাতিত্ব'কে সংগত বলে প্রমাণ করার জন্য মাওলানা মাদানী আর একটি দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

> "আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য জনসংঘ বা সমিতি গঠন করে থাকি এবং তাতে শুধু অংশই গ্রহণ করি না, তার সদস্য পদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করে থাকি। .... শহর এলাকা, ঘোষিত এলাকা, মিউনিসিপাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি এবং এ ধরনের শত শত সমিতি রয়েছে—যা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসারে গঠিত হয়েছে। এসব সমিতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সেজন্য সম্পূর্ণ কি আংশিকভাবে চেষ্টা করাকে কেউই নিষিদ্ধ করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ধরনের কোনো 'সমিতি' যদি দেশের স্বাধীনতা এবং বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাতে অংশগ্রহণ হারাম, ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত, ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত হয়ে যায়।"-(পৃষ্ঠা ঃ ৪১)

বস্তুত একেই বলে ভুলের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মাওলানা মাদানী একটি পাপের কাজকে ফরয গণ্য করতঃ তারই অন্ধপ্রেমে পড়ে অনুরূপ আর একটি পাপকে সংগত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই হারাম হওয়ার একই মূল কারণ বিদ্যমান। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে

চাই, কাউন্সিল ও এসেম্বলীতে যোগ দেয়াকে ওলামায়ে হিন্দের একদিন হারাম এবং অন্যদিন হালাল বলে ঘোষণা করা একেবারে পুতুল খেলার শামিল হয়েছে। কারণ প্রকৃত ব্যাপার লক্ষ্য করে কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার নীতি তাঁদের নয়। গান্ধীজীর একটি শব্দেই তাদের ফতোয়া দান ক্ষমতা সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু আমি ইসলামের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বলছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ফায়সালা করেছেন, সে সম্পর্কে নতুনভাবে ফায়সালাকারীর নিরংকুশ অধিকার মানুষকে দেয় যেসব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের পক্ষে তা সমর্থন করা এক চিরন্তন অপরাধ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ নিরংকুশ অধিকার ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অমুসলিমদের সংখ্যা যখন অধিক হয়ে পড়ে এবং তাতে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন এটা দ্বিগুণ অপরাধ রূপে পরিগণিত হয়। অতএব এসব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মসীমা আল্লাহর শরীআতের নির্দিষ্ট সীমা থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়াই মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য এবং তাদের পক্ষে এটাই প্রকৃত আযাদী যুদ্ধ। কর্তৃত্ব প্রয়োগের উল্লেখিত সীমা উভয়েরই যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে মুসলিম-অমুসলিম উভয় জাতির কোনো মিলিত স্বার্থের জন্য গঠিত দলের সহযোগিতা করা মুসলমানদের পক্ষে সংগত হবে। তা কোনো শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হোক, কি কোনো অর্থনৈতিক বা শৈল্পিক কাজকর্ম আনজাম দেয়ার জন্য হোক, তাতে কোনোরূপ পার্থক্য নেই।

কিন্তু উভয় জাতির কর্ম ও ক্ষমতার সীমা যতদিন পরস্পর যুক্ত থাকবে, মিলন ও সহযোগিতা তো দূরের কথা, এরূপ যুক্ত শাসনতন্ত্রের অধীন জীবন-যাপন করাও মুসলনমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসংগত। এ ব্যাপারে নির্বিশেষে সকল মুসলমানই অপরাধী বলে বিবেচিত হবে—যতদিন না তারা সকলে মিলে মিলিত শক্তির সাহায্যে উক্ত শাসনতন্ত্রকে চূর্ণ করে দিবে। আর যারা সাগ্রহে এ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে এবং তাকে চালু করার জন্য চেষ্টা করবে, তারা তদপেক্ষা বেশী অপরাধী হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি—সে যে-ই হোক না কেন—সেই শাসনতন্ত্র চালু করার অনুকূলে কুরআন-হাদীস থেকে যুক্তি পেশ করবে, তার অপরাধ হবে সর্বাপেক্ষা বেশী।

একটি ব্যাপারে যখন একই সময় একদিক দিয়ে হারামের কারণ পাওয়া যায় এবং অন্যদিক দিয়ে তাকে জায়েয বলার কারণও দেখা যায়, তখন মাত্র জায়েয হওয়ার কারণটিকে পৃথক করে দেখে তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং হারামের কারণটির দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করা,

আমার মতে কোনো পরহেযগার ও আল্লাহভীরু হওয়ার প্রমাণ নয়—আর না এতে শাস্ত্রজ্ঞানের কোনো পরিচয় আছে। মাওলানা মাদানী দেশের স্বাধীনতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা করাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন ; কিন্তু তখন তিনি একথা আদৌ মনে রাখেন না যে, যে দলটি এরূপ ধারণা নিয়ে আযাদীর জন্য চেষ্টা করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই এ শাসনতন্ত্র রচনা করে, পরিচালিত করে এবং পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। অথচ এ শাসনতন্ত্রে মানবীয় আইন পরিষদকে আল্লাহর বিধান রদবদল করার নিরংকুশ ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহর আইন তো জারী হতেই পারে না ; আর যদি কখনো জারী হয়ও, তবে তা হবে আইন পরিষদের মঞ্জুরী লাভের পর। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের নিয়ম-প্রণালী রচনার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং এর দরুন তাদের নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা ও ভবিষ্যত বংশধরের উপর তার তীব্র প্রভাব পড়তে পারে। এরূপ শাসনতন্ত্র সহকারে দেশের যে স্বাধীনতা লাভ হবে, তার পশ্চাতে আপনারা দৌড়াচ্ছেন—কারণ, কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানই আপনাদের লক্ষ্য—সে অবসান যে রকমেই হোক না কেন। এজন্য এরূপ দলে যোগ দেয়ার অনুকূল কারণটিকেই সামনে পেশ করা হচ্ছে ; কিন্তু তার নিষিদ্ধ হওয়ারও যে একটি বিরাট যুক্তিসংগত কারণ তাতে রয়েছে, সেদিকে মাত্রই লক্ষ্য দেয়া হয় না। কিন্তু আমরা এ উভয় দিকের উভয় প্রকারের কারণ সামনে রেখেই ব্যাপারটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য এবং নিষেধের কারণ দূর না করে জায়েযের কারণ গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত হতে পারি না। যেহেতু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা–এ উভয়ই আমাদের লক্ষ্য। এরূপ দৃষ্টিকোণকে যদি কেউ বৃটিশ পূজা বলে আখ্যায়িত করেন, তবে আমরা তার এ বিদ্রূপের মাত্রই পরোয়া করি না।

দুঃখজনক অজ্ঞতা

মাওলানা মাদানী অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"সম্মিলিত স্বাঁদেশিক জাতীয়তার বিরোধিতা করে শুধু এজন্য ফতোয়া দেয়া হয় যে, পাশ্চাত্য পরিভাষা অনুযায়ী স্বাদেশিক জাতীয়তা বলতে বুঝায় এমন এক সামগ্রিক রূপ, যা সম্পূর্ণরূপে ধর্মের বিরোধী এবং একমাত্র ঐ পারিভাষিক অর্থের সাথেই তা সংশ্লিষ্ট থাকবে। কিন্তু এ অর্থ সাধারণত সকলের মনে বদ্ধমূল নয়, কোনো ন্যায়পরায়ণ মুসলমানও তা সমর্থন করতে পারে না। আর বর্তমান আন্দোলনও এ অর্থের ভিত্তিতে

হচ্ছে না, কংগ্রেস এবং তার কর্মীরা এ আন্দোলন চালাচ্ছেও না, আর দেশের সামনে আমরা এটা পেশও করছি না।"-(পৃষ্ঠা ঃ ৪১)

এ দাবীর সমর্থনে বহু পুরাতন কথার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তার মূলতত্ত্ব ইতিপূর্বে কয়েকবারই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—অর্থাৎ কংগ্রেসের বিঘোষিত মৌলিক অধিকার দানের ঘোষণা। এটা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যে ঃ

"কংগ্রেস যে সম্মিলিত জাতীয়তাকে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাতেও সে এমন কোনো কাজ করতে চায় না, যার ফলে ভারতবাসীদের ধর্ম কিংবা সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ব্যক্তিগত আইনের উপর কোনোরূপ ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। সম্মিলিত স্বার্থ ও দেশীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলিত করাই তার একমাত্র ইচ্ছা। কারণ এগুলোকে বিদেশী শাসকবর্গ নিজেদের করায়ত্ত করে রেখে ভারতের অধিবাসীদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে। বিঘোষিত এলাকা, মিউনিসিপাল বোর্ড, জিলা বোর্ড, কাউন্সিল, এসেম্বলী ইত্যাদিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার হিসেবে সিদ্ধান্ত করা হয়। এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো জাতি বা ধর্ম মিলে যাওয়ার কোনো কথা নেই।"-(পৃষ্ঠা ঃ ৫৭)

মুসলমানদের এক কঠিন সংকটজনক মুহূর্তে কিরূপ স্থূল দৃষ্টি ও অবিমৃশ্যকারিতার সাথে তাদের পথনির্দেশ করা হচ্ছে, উল্লেখিত উদ্ধৃতিই তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। যে বিষয় ও সমস্যার উপর আট কোটি মুসলমানের কল্যাণ অকল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে, সে সম্পর্কে সামান্য মাত্র ত্রুটিও তাদের ভবিষ্যত সামাজিক ও নৈতিক জীবনে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, সেসব ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে 'ছেলে খেলা' বলে মনে করা হয়—সে জন্য কোনো চিন্তা-গবেষণা, অধ্যয়ন-অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয় না। অথচ তালাক, মীরাসী আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলার রায় দেয়ার ব্যাপারে এক একজন লোককে কত না চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। উল্লেখিত উদ্ধৃতির এক একটি শব্দ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, মাওলানা মাদানী জাতীয়তার পারিভাষিক অর্থ জানেন না—কংগ্রেসর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তিনি একেবারেই অনবহিত। 'মৌলিক অধিকারে'র অর্থ সম্পর্কেও তিনি এতটুকু চিন্তা করেননি। এমন কি তিনি যেসব সামগ্রিক সংঘের বারবার উল্লেখ করেন, সেসবের কর্ম ও ক্ষমতার সীমা বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোন পথে তাহযীব-তামাদ্দুন, ধর্ম

বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, তাও তিনি মাত্রই জানেন না। কালচার, তাহযীব, ব্যক্তিগত আইন ইত্যাদি শব্দসমূহকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এতবড় 'আলেম ও বুজর্গ' ব্যক্তি হয়েও এসব শব্দের অর্থ ও তত্ত্ব মাত্রই বুঝতে পারেননি—একথা আমি বিশেষ দায়িত্ব সহকারে এবং বুঝে শুনে বলছি। আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, যারা সত্যের মাপকাঠিতে ব্যক্তির যাচাই করার পরিবর্তে ব্যক্তির মানদণ্ডে সত্যের যাচাই করতে অভ্যস্ত, আমার এ সুস্পষ্ট ভাষণ তাদের অসহ্যবোধ হবে। এজন্য একথার উত্তরে আরো কয়েকটি গালাগালি শুনার জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। কিন্তু আমি যখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, ধর্মীয় নেতৃত্বের পবিত্র মসনদ থেকে মুসলমানদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হচ্ছে, প্রকৃত সত্য ও নির্ভুল তত্ত্বের পরিবর্তে তাদেরকে মিথ্যা ও অমূলক ধারণার দিকে চালান হচ্ছে এবং বিরাট ও অতল গভীর খাদযুক্ত পথকে সরল ঋজু উন্মুক্ত রাজপথ বলে তাদেরকে সেদিকে ঠেলে নেয়া হচ্ছে তখন এটা দেখে ধৈর্যধারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হলো। কাজেই আমার স্পষ্ট সত্য কথায় কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকাই আমার কর্তব্য।

আঞ্চলিক জাতীয়তার মূল লক্ষ্য

জাতীয়তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপরে লর্ড ব্রাইসের 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' এবং 'নৈতিক চরিত্র ও ধর্মসমূহের বিশ্বকোষ' থেকে যে কথা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা আর একবার পাঠ করুন। এ অর্থের দিক দিয়ে ব্যক্তিগণ একটি মাত্র মৌলিক কারণে একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে। তা এমন একটি আকর্ষণীয় শক্তি, যা এ সকলের মধ্যে প্রাণের ন্যায় বর্তমান থাকবে এবং তাদেরকে পরস্পর সংযুক্ত করে রাখবে। কিন্তু এ আকর্ষণ শুধু বর্তমান থাকলেই একটি 'জাতি' গঠিত হওয়ার জন্য তা কিছুমাত্র যথেষ্ট হয় না। একে অত্যন্ত বেশী শক্তিশালী হতে হবে, যেন যেসব ভাবধারা ব্যক্তিগণকে কিংবা ব্যক্তিদের ছোট ছোট দলকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেসবকে চূর্ণ করে দিতে পারে। কারণ বিচ্ছেদকারী জিনিসগুলো যদি মিলন সৃষ্টিকারী ভাবধারার প্রতিরোধ করার জন্য অত্যধিক দৃঢ় হয় তবে তা মিলন সৃষ্টির কাজে সাফল্য লাভ করতে পারে না—আর অন্য কথায় তা একটি 'জাতি' গঠন করতে পারে না। এতদ্ভিন্ন একটি জাতীয়তার জন্য ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, রসম-রেওয়াজ, সামাজিকতা ও জীবনধারা, চিন্তাধারা ও মতবাদ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বৈষয়িক উদ্দেশ্যেরও প্রয়োজন হয়। এসব জিনিসকেই মিলন সৃষ্টিকারী ভাবধারার প্রকৃতির সাথে

সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। অন্য কথায় বিচ্ছেদকারী ভাবধারাকে জাগ্রত করার মতো কোনো জিনিসই যেন এতে বর্তমান না থাকে। কারণ, এটা সবই ব্যক্তিদের সম্মিলিত করার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। এসবের ঝোঁক ও প্রবণতা যদি 'মিলন-বাণীর' মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই এটা মিলন সৃষ্টি করার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অন্যথায় এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে দল গঠন করবে এবং 'জাতি' সৃষ্টি করার কাজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।

এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যে দেশে এরূপ অর্থের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে, তাদেরকে সম্মিলিত ও সংযুক্ত করার সম্ভাব্য উপায় কি হতে পারে। এ সম্পর্কে যতই চিন্তা করা যায়, মাত্র দুটি উপায়ই সম্ভব বলে মনে হয়—

প্রথম এই যে, এসব জাতিকে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার সাথে স্থায়ী রেখে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শর্তে একটি 'ফেডারেল' চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। যার দরুন তারা উভয়েই শুধু মিলিত স্বার্থের জন্য একত্র হয়ে কাজ করবে এবং অন্যান্য সমগ্র ব্যাপারেই তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে। কিন্তু কংগ্রেস কি এ পন্থা অবলম্বন করেছে ? এর উত্তরে 'না' বলা ছাড়া উপায় নেই।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এ সময় জাতিকে একটি 'জাতিতে' পরিণত করে দেয়া। কংগ্রেস এটাই করতে চায় সমগ্র ভারতে।

কিন্তু ভারতের এ অসংখ্য জাতিকে 'একজাতি' কিভাবে বানানো যেতে পারে ? .... সেজন্য অনিবার্যভাবেই সর্বপ্রথম একটি সম্মিলিত আকর্ষণীয় শক্তি ও একটি কেন্দ্রীয় মিলনবাণী স্বীকৃত হতে হবে। তেমন একটি আকর্ষণী শক্তি কেন্দ্রীয় মিলনবাণী নিম্নলিখিতরূপ তিনটি জিনিসের সমন্বয়েই গঠিত হতে পারে—

এক ঃ স্বাদেশিকতাবাদ,

দুই ঃ বৈদেশিক শত্রুদের প্রতি ঘৃণা এবং

তিন ঃ অর্থনৈতিক সমস্বার্থের উৎসাহ।

এছাড়া উপরে যেমন বলেছি, এ আকর্ষণী শক্তি এতদূর শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক যে, যেসব ভাবধারা ও কারণ এ জাতিসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তা এ শক্তির সামনে যেন একেবারে ম্লান হয়ে যায়। কারণ মুসলমান যদি ইসলামের প্রতি, হিন্দু যদি হিন্দু ধর্মের প্রতি এবং শিখ যদি শিখ ধর্মের প্রতি খুব প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, আর ধর্ম ও

জাতীয়তার প্রশ্ন যখনি দেখা দিবে, তখনি যদি মুসলমান মুসলমানদের সাথে, হিন্দু হিন্দুদের সাথে এবং শিখ শিখদের সাথে মিলিত হয় এবং প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ জাতীয়তার সমর্থনে স্বতন্ত্র দল নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তবে তার অর্থ এই হবে যে, 'স্বদেশের প্রেম' এ একাধিক জাতিত্বে 'একজাতি'তে পরিণত করতে পারেনি। মুসলমান ইসলামকে স্বীকার করুক ও সালাতও আদায় করুক, হিন্দু হিন্দু মতবাদে বিশ্বাসী থাকুক, মন্দিরেও মাঝে মাঝে যাক—সেই কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু 'একজাতি' হওয়ার জন্য স্বাদেশিকতাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রত্যেককেই দিতে হবে, যেন প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ ধর্ম ও মত বিশ্বাসকে স্বদেশের জন্য কুরবান করতে সমর্থ হয়। এরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবধারা না হলে 'স্বাদেশিক' জাতীয়তা মাত্রই গঠিত হতে পারে না।

স্বাদেশিক বা আঞ্চলিক জাতীয়তার এটাই তো মূল বীজ। এ বীজ কখনো বৃক্ষ উৎপাদন করতে পারে না, যতক্ষণ না এর উপযোগী আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। সে জন্য অনুকূল ক্ষেত্র ও মৌসুম আবশ্যক। পরে বলেছি জাতীয়তার আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও প্রথা, সামাজিকতা ও জীবনধারা, চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য প্রভৃতি একান্ত অপরিহার্য। মানুষের দল সমাজকে এসব জিনিসই সুসংগঠিত করে থাকে। এটা সবই জাতীয়তার আকর্ষণী শক্তির প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্তমান থাকা আবশ্যক। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী এ বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের ঝোঁক যদি বিচ্ছেদ সৃষ্টির দিকে হয়, তবে মিলন সৃষ্টিও সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে এটা প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করবে এবং এটা কিছুতেই 'একজাতি' হতে দিবে না। কাজেই একটি সম্মিলিত জাতি গঠনের জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভাবধারা সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে নেস্তানাবুদ করা একান্ত আবশ্যক ; তদস্থলে সমগ্র জাতিকে একই রঙে রঙিন করা এবং ধীরে ধীরে তাদের সকলকে একই জাতীয়তার আদর্শে ঢেলে গঠন করা, তাদের মধ্যে সম্মিলিত স্বভাব-প্রকৃতি, সম্মিলিত নৈতিক ভাবধারা সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একই প্রকার চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শ প্রচার করে তাদেরকে এমন বানিয়ে দিতে হবে, যেন অতপর সকলেই একই সমাজের লোক বলে পরিচিত ও পরিগণিত হতে পারে। তাদের মনোভাব, দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ এক হবে—একই ইতিহাসের উৎস থেকে তাদের প্রাচীন গৌরবের ভাবধারা ফুটে বের হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টির কোনো কারণ আদৌ বর্তমান থাকবে না।

এ উদ্দেশ্যেই 'ওয়ার্ধা স্কীম' রচনা করা হয়েছে। 'বিদ্যামন্দির স্কীমের'ও এটাই উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্য এ উভয় স্কীমেই স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মাওলানা মাদানী এসব স্কীম এবং তাদের পাঠ্য তালিকা মোটেই দেখেননি। পণ্ডিত নেহরু কয়েক বছর পর্যন্ত এ জাতীয়তারই শিংগা ফুঁকছেন। কিন্তু তাঁর কোনো বক্তৃতা বা রচনাও মাওলানা মাদানীর গোচরীভূত হয়নি। কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পন্ন প্রত্যেকটি ব্যক্তি একথাই ঘোষণা করছেন, লিখছেন এবং নতুন শাসনতন্ত্রলব্ধ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তা প্রবলভাবে প্রচার করেও বেড়াচ্ছেন। কিন্তু মাওলানা মাদানী এর কিছুই শুনতে, দেখতে ও অনুভব করতে পারছেন না। অথচ তিনি যেসব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই এসব কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানেরই কর্মসীমা তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি, ব্যক্তিগত আইন ইত্যাদি সবকিছু পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রতিদিন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে এসব কাজ হচ্ছে, তার একটি ক্ষীণতম আওয়াজও মাওলানা মাদানীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। এসব জিনিসের মধ্যে তিনি কেবল একটি জিনিসই লাভ করেছেন—যার নাম 'মৌলিক অধিকার'[১]। একমাত্র এর উপর ভরসা করে তিনি 'এক জাতীয়তার' নীতিকে নবী করীম স.-এর আদর্শ বলে প্রচার করার দুঃসাহস করছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ 'মৌলিক অধিকার' সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণা অপেক্ষা কোনো দিক দিয়ে উত্তম নয়। পাশ্চাত্য কূটনীতির এরূপ ক্রুর চালকে রাসূল পাক স.-এর কাজের সাথে তুলনা করার সাহস আমাদের ন্যায় গুনাহগারদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য যাদের নিকট তাকওয়া-পরহেযগারী এতবেশী আছে যে, এরূপ অন্যায় সাহস করার পরও মার্জনা পাবার আশা করতে পারেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

একাধিক অর্থবোধক শব্দের সুযোগ গ্রহণ

মাওলানা মাদানী 'একজাতীয়তার' একটি বিশেষ অর্থ নিজের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন। এটা তিনি নিজে সকল প্রকার শয়তানী শর্ত লক্ষ্য রেখে এবং সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রশ্নের পথ বন্ধ করে তার সীমা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। একে তিনি সতর্কতার সাথে পেশ করে থাকেন, যেন শরীআতী নিয়মের দিক দিয়ে কেউ তাঁর উপর প্রশ্ন করতে না পারে। কিন্তু এর প্রধান ভুল এখানেই যে, তিনি নিজে যা ধারণা করে নিয়েছেন, কংগ্রেসও তাই ধারণা করে বলে তিনি চূড়ান্তভাবে ধরেছেন। অথচ কংগ্রেস এটা থেকে বহু বহু মনযিল দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাওলানা মাদানী যদি

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, ১ম খণ্ড।

শুধু এতটুকুই বলতেন যে, 'একজাতীয়তা' বলতে আমি এটা বুঝি, তবে তাঁর সাথে আমাদের তর্ক কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে—সামনে অগ্রসর হয়ে এটাও বলছেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্যও এটাই, কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে নবী করীম স.-এর আদর্শানুসারেই চলছে। সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিঃশংক মনে এ একজাতীয়তার আন্দোলনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়াই মুসলমানদের কর্তব্য। বস্তুত এখান থেকেই তাঁর সাথে আমাদের মতবিরোধের সূচনা। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। 'পানি ঢালা' বলতে একজন মনে করে পানি বর্ষণ করা, আর অপরজন আগুন লাগিয়ে দেয়ারই নাম রেখেছে 'পানি ঢালা'। এখন এ শাব্দিক বৈষম্য উপেক্ষা করে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে সকলেরই ঘরবাড়ী সোপর্দ করতে উপদেশ দিলে যে কত বড় যুলুম হবে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এসব ক্ষেত্রের জন্যই কুরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "কোনো শব্দ থেকে যখন ভুল-শুদ্ধ উভয় প্রকার অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব এবং সেই শব্দ ব্যবহার করে কাফেরদেরকে অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব করতে দেখতে পাও, তখন মুসলমানগণ যেন এ ধরনের শব্দ আদৌ ব্যবহার না করে।"

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ - البقرة : ١٠٤

"ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা 'রায়িনা বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনতে থাকো। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০৪

সুতরাং মাওলানা মাদানী যদি তাঁর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য 'পারস্পরিক বন্ধুতা' ইত্যাদি কোনো শব্দ ব্যবহার করতেন এবং একে কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম হিসেবে পেশ না করে নিজের তরফ থেকে একটি প্রস্তাব ও সুপারিশ হিসেবে পেশ করতেন, তবেই ভাল হতো। অন্তত এখনো যদি তিনি এ জাতির প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেন, তবে তা বড়ই মেহেরবানী হবে। অন্যথায় তাঁর লেখনীতে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রাচীনকালে একথাটির পুনরাবৃত্তিরও সম্ভাবনা রয়েছে—"যালেম রাজা-বাদশাহ ও ফাসেক রাষ্ট্র নেতারা যাকিছু করেছে, আলেমগণ তাকেই কুরআন-হাদীসের দলীল দিয়ে সত্য প্রমাণ করতঃ ধর্মকে অত্যাচার ও শোষণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।"

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ يونس : ٨٥

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেত্না বানিও না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৮৫

মাওলানা মাদানীর উল্লেখিত পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর খালেস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 'জাতীয়তার' বিশ্লেষণ করা এবং এ ব্যাপারে ইসলামী ও অনৈসলামী মতবাদের পারস্পরিক মূলগত পার্থক্য উজ্জ্বল করে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তা করা হলে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ভুল ধারণা লোকদের মন থেকে দূর হবে এবং এ উভয় পথের কোনো একটি পথ বুঝেশুনে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এটা আলেমদেরই কর্তব্য ছিল, কিন্তু আলেম সমাজের 'প্রধান' ব্যক্তি যখন 'একজাতীয়তা'র পাতাকা উত্তোলন করেছেন এবং কোনো আলেমই যখন তাঁদের প্রকৃত কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হচ্ছেন না, তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোককেই তার জন্য তৎপর হতে হবে।–তরজমানুল কুরআন ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ইং

❐

জাতীয়তাবাদ কি কখনো মুক্তি বিধান করতে পারে

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী দীর্ঘদিন নির্বাসিত জীবন যাপনের পর যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 'বংগীয় জমিয়াতে উলামা'র পক্ষ থেকে তার কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তা পাঠ করে ভারতবাসীগণ সর্বপ্রথম তাঁর বিশেষ মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবার সুযোগ পায়। তাঁর ভাষণের যেসব অংশ বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ "যে বিপ্লব এখন সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছে ও প্রত্যেক দিন গ্রাস করে চলেছে, তার অপকারিতা ও ক্ষতি থেকে আমার দেশ যদি রক্ষা পেতে চায় তবে তাকে ইউরোপীয় আদর্শের জাতীয়তাবাদকে উন্নতি ও বিকাশ দান করতে হবে। বিগত যুগে আমাদের দেশ যতখানি সুখ্যাত ছিল, বিশ্ববাসী সে সম্পর্কে তা সুবিদিত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জাতি-সমূহের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে পূর্বখ্যাতী থেকে আমরা কিছুমাত্র উপকৃত হতে পারবো না।"

দুই ঃ "আমি সুপারিশ করছি, আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের দুশত বছর কালীন শাসন আমলের যতদূর সম্ভব উপকারিতা লাভ করতে চেষ্টা করুন। ইউরোপের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে আমাদের উন্নতিকে যেভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি, এখন আমাদেরকে তা ত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি সুলতান মাহমুদ থেকে মোস্তফা কামালের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র পর্যন্ত তুর্কী জাতির বিপ্লবকে পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউরোপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে আমাদের দেশ সম্মানিত সদস্য হিসেবে গণ্য হোক, এটাই আমি কামনা করি। কিন্তু সেজন্য অবশ্য আমাদের সমাজ ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোধ হতে হবে।"

এ সমাজ বিপ্লবের ব্যাখ্যা করে মাওলানা সিন্ধী সিন্ধু প্রদেশের জন্য একটি বিপ্লবাত্মক কার্যসূচী উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন ঃ

"সিন্ধুবাসী নিজেদের দেশে উৎপন্ন কাপড় পরিধান করবে ; কিন্তু তা কোট ও প্যান্টের আকারে হবে কিংবা কলারধারী শার্ট ও 'হাফপ্যান্ট' রূপে। মুসলমানগণ হাটুর নীচ পর্যন্ত দীর্ঘ হাফপ্যান্ট পরিধান করতে পারে। এ

উভয় অবস্থায়ই হ্যাট্ ব্যবহার করা হবে। মসজিদে মুসলমানগণ হ্যাট খুলে রেখে নগ্ন মাথায় সালাত আদায় করবে।"

মাওলানা সিন্ধী একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বদর্শী ব্যক্তি। তিনি নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্য কয়েক বছর পর্যন্ত যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা থেকে তাঁর ঐকান্তিক আদর্শ-নিষ্ঠারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তিনি যদি আমাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান পেশ করেন, তা বাহ্যদৃষ্টিতে যতই অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-গবেষণার ফল হোক না কেন, নিজেদের মনকে সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত করে তাঁর মতবাদগুলোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখাই আমাদের কর্তব্য।

একজন পারদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে যাকিছু বলেন, তার অন্তর্নিহিত ভুলভ্রান্তি তাঁর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে তিনি তা ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হবেন না, এটাই আমাদের বিশ্বাস। আর তিনি যদি তা পরিত্যাগ করতে একান্তই প্রস্তুত না হন, তবে বৈজ্ঞানিক সমালোচনার তীব্র আঘাতে এ ভুল মতবাদের মূলোৎপাটন একান্ত আবশ্যক।

সুবিধাবাদের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ

ইউরোপীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদকে উৎকর্ষ দানের জন্য ভাষণদাতা যেসব কারণ ও যুক্তি-পরামর্শ দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ "গোটা পৃথিবীকে যে বিপ্লবী ভাবধারা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং আরো গ্রাস করে চলেছে, তা থেকে আমাদের দেশ রক্ষা পেতে চাইলে ....." ঐরূপ করতে হবে।

দুই ঃ "আমাদের অতীত কীর্তি ও যশঃগাথা দুনিয়াবাসী জানে বটে ; কিন্তু তা থেকে আমরা কিছুমাত্র উপকৃত হতে পারবো না, যদি না বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে আমরা যথাযথ স্থান ও মর্যাদা দখল করে নিতে পারি।"

আর এ স্থান ও মর্যাদা একমাত্র পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অনুকরণ করলেই লাভ করা যায়—এটা সুস্পষ্ট কথা।

তিন ঃ আমাদের ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন অধ্যায়—যা হিন্দু-সভ্যতা নামে পরিচিত এবং আধুনিক যুগ—যা ইসলামী সভ্যতা নামে খ্যাত—উভয়ই ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় মতবাদ ধর্মীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তা কেবল বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিতেই স্থাপিত। কাজেই আমাদের দেশে যদি

এ বিপ্লব অনুধাবন করার যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্তই হতে হবে।"

এখানে 'অনুধাবন করার যোগ্যতা' বলতে খুব সম্ভব গ্রহণ করার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা বক্তার পূর্বোক্ত সূত্রগুলো তাই প্রমাণ করে।

এ তিনটি কথাই যাচাই ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ একটি জিনিস সত্য কিংবা নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে তা গ্রহণ করার আহ্বান দেয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে অবস্থার গতিতে ও সুবিধাবাদী নীতিতে (Expediency) দরকার বলে। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান আদর্শবাদী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এ উপদেশের কি মূল্য হতে পারে। অমুক ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে এ কাজ করা দরকার, এটা করলে এ স্বার্থ লাভ হবে ; কিংবা অমুক জিনিস এখন দুনিয়ায় চলতে পারে না, তার পরিবর্তে 'এটা' চালাতে হবে— এরূপ দৃষ্টিভংগী কোনো আদর্শবাদী, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক মতাদর্শশীল কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না। এটা নিতান্ত সুবিধারাদী দৃষ্টিভংগী (Opportunism) ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও নীতি-দর্শনের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক থাকতে পারে না। একজন নীতিবাদী ও আদর্শানুসারী মানুষ চিন্তা-গবেষণা ও যাচাই-বিশ্লেষণের পর যে মত ও আদর্শ সত্য মনে করে গ্রহণ করবে, সে দৃঢ়তার সাথেই সেই অনুযায়ী কাজ করবে, এটাই একমাত্র সঠিক কর্মনীতি। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে কোনো ভ্রান্তনীতি অনুসারে কাজ হতে থাকলে তার পশ্চাদনুগামী না হয়ে নিজ আদর্শের দিকেই গোটা মানব সমাজকে টেনে আনার জন্য চেষ্টা করাই তার কর্তব্য। দুনিয়ার অনুগমন না করলে যদি আমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়, তবে তা বিশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বরদাশত করাই বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার পশ্চাতে না চলার কারণেই যদি তার নিকট আমাদের কোনো মর্যাদা স্বীকৃত না হয় তবে এমন দুনিয়ার উপর আমাদের পদাঘাত করাই উচিত। পার্থিব মান ও মর্যাদা আমাদের মাবুদ নয়—প্রভু নয়, তার মনস্তুষ্টির জন্য আমরা যত্র-তত্র ধাবিত হতে পারি না। আমরা যাকে সত্য মনে করি, তার 'যুগ' যদি অতীত হয়েও থাকে তবুও আমাদের মধ্যে যুগের 'কান' ধরে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার মত ব্যক্তিত্ব ও আত্মজ্ঞান বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তিত করা কাপুরুষের নীতি হতে পারে, কোনো আদর্শবাদী মানুষের নয়।

এ ব্যাপারে মুসলমানদের অন্ততঃ এতখানি দৃঢ়তা ও আদর্শবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত, যতখানি কার্লমার্কসের পদাংক অনুসারীরা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখিয়েছিল। ১৯১৪ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ছিল, তখন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' মেম্বরদের মধ্যে এ জাতীয়তাবাদ নিয়ে ভয়ানক মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে যেসব সোশ্যালিস্ট কাজ করতো তারা নিজ নিজ জাতিকে যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে অন্ধ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয় এবং তারা সাম্প্রতিক যুদ্ধে নিজ নিজ জাতির পক্ষ সমর্থন করতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু মার্কসবাদীরা ঘোষণা করলো যে, আমরা যে আদর্শ (?) নিয়ে লড়াই শুরু করেছি, তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল জাতির পুঁজিবাদীরাই আমাদের শত্রু এবং সকল মজুর-শ্রমিকগণ আমাদের বন্ধু, এমতাবস্থায় আমরা জাতীয়তাবাদকে কি করে সমর্থন করতে পারি ! কারণ এটা মজুরদেরকে পরস্পর বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে পুঁজিবাদীদের সাথে মিলে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ই করতে উদ্বুদ্ধ করে ও এ নীতির ভিত্তিতেই মার্কসবাদীগণ নিজেদের বহু প্রাচীন কম্‌রেডদের সম্পর্ক ত্যাগ করে। তারা 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা' ভেঙে যাওয়া সহ্য করলো, কিন্তু নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে মোটেই প্রস্তুত হলো না। অধিকন্তু পাক্কা কমিউনিস্টগণ নিজ নিজ হাতে এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দেবমূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল। জার্মানের কমিউনিস্টগণ নিজেদের আদর্শের জন্য জার্মানীর বিরুদ্ধে, রুশীয় কমিউনিস্টগণ নিজেদের আদর্শের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং এভাবে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টগণ নিজ নিজ আদর্শের জন্য নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

কমিউনিস্টদের যেমন একটি মত ও আদর্শ রয়েছে, একজন মুসলমানেরও অনুরূপভাবে একটি মত ও আদর্শ রয়েছে। এমতাবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কিংবা কারো নিকট সামান্য মর্যাদা লাভ করার জন্য একজন মুসলমান তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে কেন ? .... সে যদি একান্তই বিচ্যুত হয়—তবে সে কী ত্যাগ করে কী গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তা সর্বপ্রথমে ভাল করে বুঝে নেয়া তার কর্তব্য। কেননা একটি নীতি পরিত্যাগ করা নিছক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয় ; কিন্তু নীতিবিচ্যুত হওয়ার পরও নিজেকে নীতির অনুসারী মনে করা যেমন দুর্বলতা তেমনিতা অচৈতন্যের লক্ষণও বটে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে ইসলামী মত ও বিধান অনুসারে কাজ করবো, ঠিক ততক্ষণই আমি 'মুসলিম' থাকতে পারবো। আমি যদি এ মত কখনো পরিত্যাগ করে অন্য কোনো মত গ্রহণ করি, তবে তখনো আমার নিজকে 'মুসলমান' মনে করা মারাত্মক অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। মুসলমান হয়েও অনৈসলামিক মতবাদ গ্রহণ করা সুস্পষ্টভাবে অর্থহীন। 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান', 'কমিউনিস্ট মুসলমান' প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী পরিভাষা—

এটা ঠিক ততখানি ভুল, যতখানি ভুল 'ফ্যাসিস্ট কমিউনিস্ট', 'যৈন-কশাই' 'কম্যুনিস্ট জমিদার' 'তাওহীদবাদী মুশরিক' ইত্যাদি বলা।

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদের অর্থ ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যারা চিন্তা করবে তারা নিসন্দেহে স্বীকার করবে যে, অন্তর্নিহিত ভাবধারা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে ইসলাম এবং জাতীয়তাবাদ পরস্পর বিরোধী দুটি আদর্শ। ইসলাম নির্বিশেষে সমগ্র মানুষকে আহ্বান জানায় মানুষ হিসেবে। সমগ্র মানুষের সামনে ইসলাম একটি আদর্শগত ও বিশ্বাসমূলক নৈতিক বিধান পেশ করে—একটি সুবিচার ও আল্লাহভীরুমূলক সমাজ ব্যবস্থা উপস্থিত করে এবং নির্বিশেষে সকল মানুষকেই তা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। অতপর যারাই তা গ্রহণ করে, সমান অধিকার ও মর্যাদা সহকারে তাদের সকলকেই তার গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। ইসলামের ইবাদাত, অর্থনীতি, সমাজ, আইনগত অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি কোনো কাজেই ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে জাতিগত, বংশগত, ভৌগলিক কিংবা শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে না। ইসলামের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি বিশ্বরাষ্ট্র (World State) গঠন করা, যাতে মানুষের মধ্যে বংশগত ও জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষের সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করে সমগ্র মানুষকে সমান অধিকার লাভের জন্য সমান সুবিধা দিয়ে একটি তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। সমাজের লোকদের মধ্যে শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতা সৃষ্টি করা হবে। ফলে সকল মানুষ পরস্পরের জন্য বৈষয়িক উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাহায্যকারী হবে। মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য ইসলাম যে নীতি ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে, সাধারণ মানুষ তা ঠিক তখন গ্রহণ করতে পারে, যখন তার মধ্যে কোনোরূপ জাহেলী ভাবধারা ও হিংসা-বিদ্বেষ বর্তমান থাকবে না। জাতীয় ঐতিহ্যের মায়া, বংশীয় আভিজাত্য ও গৌরবের নেশা, রক্ত এবং মাটির সম্পর্কের অন্ধ মোহ থেকে নিজকে মুক্ত করে কেবল মানুষ হিসেবেই তাকে সত্য, সুবিচার, ন্যায় ও সততা যাচাই করতে হবে—একটি শ্রেণী, জাতি বা দেশ হিসেবে নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতার কল্যাণের পথ তাকে সন্ধান করতে হবে।

পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে জাতীয়তার দৃষ্টিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের ফলে অনিবার্যরূপে প্রত্যেক জাতির জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি নিজ জাতিকে অন্যান্য সমগ্র জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করবে। সে যদি

অত্যন্ত হিংসুক জাতীয়তাবাদী (Aggressive Nationalist) না-ও হয়, তবুও নিছক জাতীয়তাবাদী হওয়ার কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুনের দিক দিয়ে সে নিজ জাতি ও অপর জাতির মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য হবে। নিজ জাতির জন্য যতদূর সম্ভব অধিক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। জাতীয় স্বার্থের জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর দাঁড় করতে বাধ্য হবে। উপরন্তু যেসব ঐতিহ্য ও প্রাচীন বিদ্বেষভাবের উপর তার জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত, তার সংরক্ষণের জন্য এবং নিজের মধ্যে জাতীয় আভিজাত্যবোধ জাগ্রত রাখার জন্য তাকে চেষ্টানুবর্তী হতে হবে। অন্য জাতির লোককে সাম্যনীতির ভিত্তিতে জীবনের কোনো বিভাগেই সে নিজের সাথে শরীক করতে প্রস্তুত হতে পারবে না। তার জাতি যেখানেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর বেশী স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকবে বা লাভ করতে পারবে, সেখানে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে সুবিচারের একটি কথাও ব্যক্ত হবে না। বিশ্বরাষ্ট্রের (World State) পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্র (National State) প্রতিষ্ঠা করাই হবে তার চরম লক্ষ্য। সে যদি কোনো বিশ্বজনীন মতাদর্শ গ্রহণ করে, তবুও তা নিশ্চিতরূপে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হবে। কারণ তার রাষ্ট্রে অন্যান্য জাতীয় লোকদেরকে সমান অংশীদার হিসেবে কখনো স্থান দেয়া যেতে পারে না। অবশ্য গোলাম ও দাসানুদাস হিসেবেই তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এখানে এ দ্বিবিধ মতবাদের নীতি, উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাধারণ আলোচনাই করা হলো। এতটুকু আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এ দুটি সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। যেখানে জাতীয়তাবাদ হবে, সেখানে ইসলাম কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে যেখানে ইসলাম কায়েম হবে, তথায় এ জাতীয়তাবাদ এক মুহূর্তও টিকতে পারে না। জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও উৎকর্ষ হলে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথ সেখানে অবরুদ্ধ হবে। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয়তাবাদের মূল উৎপাটিত হবেই। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির পক্ষে একই সময় এ উভয় মতবাদের ধারক ও অনুসারী হওয়া সম্ভব হতে পারে না। একজন লোক একই সময় কেবলমাত্র একটি মতকে গ্রহণ করতে পারে। একই সময় এ দুই বিপরীতমুখী নৌকায় আরোহণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। একটি অনুসরণ করে চলার দাবী করার সাথে সাথেই তার ঠিক বিপরীত আদর্শের সমর্থন, সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব করা মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক। যারা এরূপ করছে তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে বাধ্য হয়েই বলতে হবে যে, হয় তারা ইসলামকে বুঝতে পারেনি, নয় জাতীয়তাবাদকে, কিংবা এ দুটির মধ্যে কোনোটিকেই তারা সঠিকরূপে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অবস্থা

জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে চিন্তা করলেই যা বুঝতে পারা যায়, উপরে শুধু তারই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আরো অগ্রসর হয়ে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকেও যাচাই করতে হবে।

প্রাচীন জাহেলী যুগে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লোকদের ধারণা খুব পরিপক্কতা লাভ করতে পারেনি। মানুষ তখনও জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি বলে বংশীয় বা গোত্রীয় ভাবধারায়ই অধিকতর নিমজ্জিত ছিল। ফলে সে যুগে জাতীয়তাবাদের নেশায় বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরিস্টোটল-এর ন্যায় একজন উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাশীল তাঁর Politics গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলো গোলামী করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মতে এসব মানুষকে গোলাম বানাবার জন্য যুদ্ধ করা অর্থোৎপাদনের অন্যতম উপায়। কিন্তু আমরা যখন দেখি গ্রীকরা সকল অ-গ্রীক লোকদেরকেই 'বর্বর' বলে মনে করতো, তখনি এরিস্টোটলের উল্লেখিত মতের মারাত্মকতা অনুভব করা যায়। কারণ তারা নিশ্চিতরূপে মনে করতো যে, গ্রীসের লোকদের নৈতিক চরিত্র ও মানবিক অধিকার দুনিয়ার অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জাতীয়তাবাদের এ প্রাথমিক বীজই উত্তরকালে ইউরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য খৃস্টীয় মতবাদ এর অগ্রগতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিরোধ করে রেখেছিল। একজন নবীর শিক্ষা—তা যতই বিকৃত হোক না কেন—স্বাভাবিকভাবে গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিবর্তে বিশাল মানবিক দৃষ্টিভংগীই গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু রোমান সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক রাষ্ট্রনীতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে একটি মিলিত কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন ও অনুসারী করে দিয়েছিল বলে জাতীয় ও গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষের তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস করে দিয়েছিল। এভাবে কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত পোপের আধ্যাত্মিক এবং সম্রাটের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব পরস্পর মিলে খৃস্টান জগতকে নিবিড়ভাবে যুক্ত রেখেছিল। কিন্তু এ উভয় শক্তিই অত্যাচার-নিষ্পেষণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধিতায় পরস্পরের সাহায্য করতো। পার্থিব ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও বৈষয়িক স্বার্থ বন্টনের ব্যাপারে এরা পরস্পরের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। একদিকে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংগ্রাম, অন্যদিকে তাদের অসৎ কার্যকলাপ ও যুলুম নিষ্পেষণ এবং তৃতীয় দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নবজাগরণ ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। এ আন্দোলনকে 'সংশোধনের আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়।

এ আন্দোলনের ফলে পোপ ও সম্রাটের প্রগতি ও সংশোধন বিরোধী শক্তির সমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু অন্যদিকে এ ক্ষতিও হলো যে, এর দরুন একই সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সংশোধনী (Reformation) আন্দোলন বিভিন্ন খৃস্টান জাতির এ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যস্থিত কোনো বিকল্প পেশ করতে পারলো না। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য এবং সংহতি চূর্ণ হওয়ার পর জাতিগুলো যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, তখন তারা বিক্ষিপ্তভাবেই নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে লাগলো। প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করতে লাগলো। প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ অন্যান্য প্রতিবেশী জাতি থেকে বিভিন্ন হয়ে দেখতে লাগলো। এভাবে বংশীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ভিত্তিতে নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করলো। এটা বংশীয় আভিজাত্যবোধ ও হিংসা-দ্বেষের স্থান অধিকার করতে লাগলো। অতপর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Competition) মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। যুদ্ধ ও সংগ্রাম বাধতে শুরু করলো। একজাতি অন্য জাতির স্বার্থে দ্বিধাহীনচিত্তে আঘাত হানতে শুরু করলো। অত্যাচার-নিষ্পেষণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকলো। এর ফলে জাতীয়তা সম্পর্কীয় ভাবধারার মধ্যে তিক্ততা তীব্রতর হতে লাগলো। এভাবে জাতীয়তাবোধ (Sence of Nationality) 'জাতীয়তাবাদে' (Nationalism) পরিণত হলো।

ইউরোপে এই যে জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটলো, প্রতিবেশী জাতিগুলোর সাথে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ সৃষ্টির পরই তা হয়েছিল বলে তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে নিম্নলিখিত চারটি ভাবধারা শামিল হয়েছে ঃ

এক ঃ জাতীয় আভিজাত্য গৌরব। এর দরুন এক একজন লোক নিজের জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের অন্ধ পূজারী হয়ে পড়ে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিজ জাতিকে সর্বতোভাবে উচ্চ, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে শুরু করে।

দুই ঃ জাতীয় অহমিকতা। এর দরুন মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধে উঠে সকল অবস্থায় নিজ জাতিকেই সমর্থন করে যেতে হয়।

তিন ঃ জাতীয় সংরক্ষণের ভাবধারা। এটা জাতির প্রকৃত ও কাল্পনিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাতিকে দেশরক্ষা থেকে শুরু করে পররাজ্য আক্রমণ করা পর্যন্ত অনেক কাজ করতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমদানী রফতানী শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধি করা, অপর জাতির লোকদের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা, নিজ দেশের চতুঃসীমার মধ্যে অন্য জাতির লোকদের জন্য রুযী-রোযগার ও নাগরিক অধিকার লাভ করার পথ বন্ধ করা, দেশ রক্ষার

জন্য অত্যধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করা এবং নিজ দেশ ও জাতির সংরক্ষণের জন্য অপর রাজ্যে গমন করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

চার ঃ জাতীয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ (National Aggrandisment)। এটা প্রত্যেক উন্নতিশীল ও শক্তিসম্পন্ন জাতির মধ্যে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের ভাবধারা জাগ্রত করে। অন্য জাতির অর্থ ব্যয় করে নিজের সমৃদ্ধি বিধানে সচেষ্ট করে। অনুন্নত জাতি-গুলোর মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের কাজে নিজেকে দায়ী বলে মনে করে এবং অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ভোগ করার তার জন্মগত অধিকার রয়েছে মনে করে শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিদের শোষণ করে।

ইউরোপের এ জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়েই কেউ ঘোষণা করে "জার্মানী সকলের উপর" কেউ দাবী করে "আমেরিকা খোদার নিজের দেশ।" কেউ বলে "ইটালীবাসী হওয়াই ধর্মের মূলকথা।" কারো মুখে এ ঘোষণা শ্রুত হয় যে, "শাসন করার জন্মগত অধিকার একমাত্র বৃটিশের।" এভাবে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিই একটি ধর্মমতের ন্যায় এ মত পোষণ করে—"আমার দেশ—ন্যায় করুক, কি অন্যায়" (My Country Wrong or Right)। বস্তুত জাতীয়তাবাদের এ উন্মাদনা বর্তমান দুনিয়ার মানবতাকে নির্মমভাবে অভিশপ্ত করেছে। এটা মানব সভ্যতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক। এটা মানুষকে নিজ জাতি ছাড়া অন্যান্য লোকদের পক্ষে হিংস্র পশুতে পরিণত করছে।

শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাকে স্বাধীন, সমৃদ্ধ এবং উন্নতশীল দেখার প্রত্যাশী হওয়াকেই জাতীয়তাবাদ বলা হয় না। কেননা মূলত এটা এক পবিত্র ভাবধারা সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে নিজ জাতিকে ভালবাসা নয়—বিজাতির প্রতি শত্রুতা, ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ ও প্রতিশোধ নেয়ার আক্রোশই এ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে এবং এটাই তা লালন-পালন করে। জাতীয়তাবাদের আক্রমণে আহত মনোভাব ও নিষ্পেষিত জাতীয় উন্মাদনা মানুষের মনে এক প্রকার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হয় জাতীয়তাবাদের জীবন উৎস। এ আগুন এ বর্বর যুগের অহমবোধ জাতি প্রেমের মহান পবিত্র ভাবধারাকেও সীমাতিক্রান্ত করে এক অপবিত্র জিনিসে পর্যবসিত করে। এক একটি জাতির মধ্যে এ ভাবধারা বিজাতির প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক কোনো অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই প্রথমে জাগ্রত হয়। কিন্তু কোনো নৈতিক বিধি-নির্দেশ আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং আল্লাহর শরীআত যেহেতু তার পথনির্দেশ করে না, এজন্য এটা সীমা অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদ

(Imperialism), অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism), বংশীয় বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগের একজন নামকরা লেখক Francis W-Cocker লিখেছেনঃ

"কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী লেখক দাবী করেন যে, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকার কেবল উন্নতিশীল জাতিগুলোরই রয়েছে ...... যাদের উন্নততর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য বিদ্যমান। তাঁর যুক্তি এই যে, একটি উচ্চ শ্রেণীর সভ্যজাতির অধিকার ও কর্তব্য কেবল নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্পন্ন করাই নয়, বরং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলোর উপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করাও তাদের অধিকারভুক্ত এবং কর্তব্য—সে জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও বাধা নেই। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক উন্নত জাতিরই একটা বিশ্ব ব্যাপক মর্যাদা থাকে, তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা প্রতিভাকে কেবলমাত্র নিজেদের দেশের মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কিংবা স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে কেবল নিজের উন্নতি সাধনের জন্যেই তার প্রয়োগ করার কোনোই অধিকার নেই। ..... বস্তুত এরূপ মত ও যুক্তি ধারাই ঊনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে। আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের 'অর্ধসভ্য' জাতিসমূহকে ইউরোপ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির অধীন করা হয়েছিল ঠিক এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে।"

তিনি আরও লিখেছেন—

"এখনও বলা হয় যে, একটি বড় জাতির উপর যখন আক্রমণ হয়, তখন শুধু প্রতিরোধ করার অধিকারই তার হয় না, বরং তার স্বাধীন জীবনধারা ও সমৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর যে কোনো কাজের প্রতিরোধ করার অধিকারও তার থাকে। নিজেদের সীমান্তের সংরক্ষণ, নিজস্ব উপায়-উপাদানকে নিজেদেরই কর্তৃত্বাধীনকরণ এবং নিজেদের সম্মানের নিরাপত্তা বিধানই একটি জাতির জীবনের জন্য যথেষ্ট নয়। বেঁচে থাকতে হলে তাকে আরো অনেক কিছু করতে হবে। তাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে, ছড়িয়ে পড়তে হবে, নিজস্ব সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চাকচিক্য বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় সে জাতি ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে নেমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি বিস্তার করতে যে জাতি যতবেশী সাফল্য লাভ করবে, সে জাতির বেঁচে থাকার অধিকার ততই বেশী হবে।

যুদ্ধে জয়ী হওয়াই জাতির যোগ্যতম (Fittest) হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ডাঃ বীজহাট-এর কথায় "যুদ্ধ জাতি গঠন করে।"

তিনি অতপর লিখেছেন—

"ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতাদর্শকেও এসব মতবাদের সমর্থনে সম্পূর্ণ ভুলের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্নেস্ট হেকল (Ernist Haekel) জার্মানে ডারউইনবাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী 'বাণী বাহক' ছিলেন ! তিনি তাঁর জীব বিজ্ঞান (Biological) সংক্রান্ত মতবাদ খুবই সতর্কতার সাথে দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানে (Sociology) ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বার্থপরতা ও আত্মপূজাকে এক সার্বিক জীবন বিধান মনে করেন এবং বলেন, এ আইন মানব সমাজে এক প্রকার বংশীয় মানব ধ্বংসের ব্যবস্থা হিসেবে জারী হয়ে থাকে। তাঁর মতে পৃথিবীর বুকে যত প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে, তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট উপজীব্য এখানে বর্তমান নেই। ফলে দুর্বল প্রাণীর বংশ শেষ হয়ে যায়। কেবল এজন্য নয় যে, পৃথিবীর সীমাবদ্ধ উপজীব্য আহরণ করার জন্য যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তাতে এরা অন্যান্যদের সাথে সাফল্যজনকপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হয় না, বরং এজন্যও যে, শক্তিশালী প্রাণীসমূহের বিজয়ী পদক্ষেপের প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাও তাদের মধ্যে হয় না। এভাবে কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson) আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রামকে 'মানবজাতির স্বাভাবিক ইতিহাসের এক অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর দাবী এই যে, বৈজ্ঞানিক ধারণার (Scientific View of Life) দিক দিয়ে মানব সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ মূলত সেই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের কারণে ঘটে থাকে, যা শুধু ব্যক্তিদের মধ্যেই নয় —জাতিসমূহের মধ্যেও চিরন্তনভাবে বর্তমান থাকে। একটি উচ্চ শ্রেণীর জাতি যখন দুর্বল বংশধরদের ধ্বংস করার এবং কেবল শক্তিশালী বংশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে নিজের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা বৃদ্ধি করে নেয়, তখন সে অন্যান্য জাতিসমূহের সাথে মুকাবিলা করে নিজের বাহ্যিক যোগ্যতাকে (Fitness) বিকশিত করতে শুরু করে। এ দ্বন্দ্বে দুর্বল (অযোগ্য) জাতিসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শক্তিশালী জাতিসমূহই অবশিষ্ট থাকে। এরূপে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এ জাতি অন্যান্য উন্নততর জাতির সমতুল্য হওয়ার প্রমাণ ঠিক তখনি দিতে পারে, যখন তা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কাঁচামাল ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের সাথে নিরন্তর সাধনা-প্রতিযোগিতা করতে থাকে। যদি নিম্নস্তরের জাতিগুলোর সাথে মিলেমিশে থাকতে শুরু করে, তবে মনে

করতে হবে যে, সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রত্যাহার করেছে। আর সেইসব জাতিকে নির্বাসিত করে নিজেই যদি সেই দেশ অধিকার করে কিংবা তাদেরকে বসবাস করার অধিকার দান করে তাকে স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে, তবে তাতেই একটা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

-Recent Political Thought, New York, 1934, p. 443-48.

জোসেফ লিটেন (Joseph Lighten) নামক অন্য একজন গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

"পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে দুনিয়ার ইতিহাস অপেক্ষাকৃতভাবে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ক্রমাগতভাবে জাতিসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিবন্ধকতার সূচনা হয়। তারপরই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমেরিকা, আফ্রিকা, সাত সমুদ্রের দ্বীপসমূহ এবং এশিয়ার বড় বড় অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন এবং এসব দেশের অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান শোষণ (Exploitation) করা—প্রভৃতি এ লুট-তরাজ ইতিহাসেরই বিভিন্ন অধ্যায় মাত্র। যদিও এসব কিছুই রোমকদের পতনের পর লুট-তরাজ করতে করতে বর্বর জাতিদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার সময়ও খুব ক্ষুদ্র আকারে সংঘটিত হয়েছিল। তবে পার্থক্য এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু নতুন পৃথিবীতে তা সম্ভব হয়নি।"

-Social Philosophies in Conflict, New Yourk 1937, p.439.

এ গ্রন্থকারই অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পন্ন একটি জাতি যখন রাজনীতির দিক দিয়ে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমস্বার্থ বিশিষ্ট হয় এবং এরূপ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাতীয়তায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগ্রত হয়, তখন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ অনিবার্যরূপে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। কারণ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের প্রচলন রয়েছে, তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এ জাতীয়তাবাদ। আর এ জাতীয়তাবাদই অনতিবিলম্বে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা করার জন্য জাতিসমূহ

পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং বৈদেশিক বাজার এবং পশ্চাদবর্তী দেশের অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়।"

"রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সমস্যা—যার সমাধানের কোনো উপায়ই পাওয়া যায়নি—এই যে, একদিকে একটি জাতির কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্য একটি জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং তার কেবল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই নয়—তার সাংস্কৃতিক উন্নতি, তার শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প—তার প্রত্যেকটি বিষয়ের উৎকর্ষ লাভ জাতীয় রাষ্ট্রের উন্নতি ও শক্তি লাভের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু অপরদিকে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়ে পড়ে। প্রত্যেক জাতির ক্ষতি করে নিজের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করে। এর ফলে জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রতিহিংসা, সন্দেহ, ভয় ও ঘৃণার ভাবধারা প্রতিপালিত হতে থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে প্রকাশ্য ময়দানে সামরিক সংঘর্ষ পর্যন্ত অবাধগতি এবং এটা অত্যন্ত নিকটবর্তী পথ।"–প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শের পার্থক্য

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ, তার চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মনীতি আমার নিজের কথায় প্রকাশ করার পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের ভাষায়ই এখানে পেশ করা আমি অত্যধিক ভাল মনে করেছি। এর ফলে স্বয়ং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখনীর সাহায্যেই পাঠকদের সামনে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত চিত্র সঠিকরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপে যেসব ধারণা-কল্পনা এবং যেসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ স্থাপিত ও বিকশিত হয়েছে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথা অনস্বীকার্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, তা সবই মানবতার পক্ষে নিঃসন্দেহে মারাত্মক। এসব নীতি ও ধারণা মানুষকে পাশবিকতা—চরম হিংস্রতার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। যা আল্লাহর পৃথিবীকে যুলুম-পীড়ন ও রক্তপাতে জর্জরিত করে দেয় এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রতিরোধ করে। আদিকাল থেকে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ দুনিয়াতে যে মহান উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের এ নীতি তা সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আল্লাহর শরীআত যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় এসেছে, যেসব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, উপরোক্ত শয়তানী

নীতি তার প্রতিরোধকারী। এটা মানুষকে সংকীর্ণমনা, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও হিংসুক করে দেয়।[১] এটা জাতি ও বংশসমূহকে পরস্পরের প্রাণের দুশমন বানিয়ে সত্য, ইনসাফ ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দেয়। বৈষয়িক শক্তি ও পাশবিক বলকে এটা নৈতিক সত্যের স্থলাভিষিক্ত করে ইলাহী শরীআতের মর্মমূলে কঠিন আঘাত হানে।

মানুষের পরস্পরের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে বিশাল ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল বানিয়ে দেয়া ইলাহী শরীআতের চিরন্তন উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতীয়তাবাদ বংশীয়-গোত্রীয় ও ভৌগলিক বৈষম্যের ক্ষুরধার তরবারী দ্বারা এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় এবং জাতীয় হিংসা-দ্বেষ সৃষ্টি করে মানুষকে পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করে।[২]

মানুষের পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব স্বাধীন সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপনের উদার অবকাশ সৃষ্টি করাই ইলাহী শরীআতের লক্ষ্য। কারণ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা এরই উপর নির্ভর করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এ সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। ফলে এক জাতির প্রভাবান্বিত এলাকায় অপর জাতির পক্ষে জীবন ধারণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খোদায়ী শরীয়তের লক্ষ্যবস্তু হলো প্রতিটি ব্যক্তি ; প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি প্রজন্ম তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং জন্মগত যোগ্যতা লালন করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক, যাতে সামগ্রিকভাবে মানবতার উন্নতি বিধানে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রতিটি জাতি আর

---

১. জাতি পূজাসূচক সংকীর্ণতার চরম নিদর্শন এই যে, জাপানে ভারতীয় আমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ যেন ভূমিতে উৎপন্ন আল্লাহর একটা নিয়ামত যা একটা জাতির কিছু লোক নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে কেবল এজন্য যে, তা অন্য এক জাতির দেশে কেন উৎপন্ন হয়েছে।

২. গত বৎসর জাতীয়তাবাদের এ ক্যারিশমা সারা বিশ্ব দেখতে পেয়েছে যে, বার্মার ভয়ংকর দাঙ্গায় (বার্মী জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা ছিল যার কারণ) বার্মী বৌদ্ধরা সাধারণ ভারতীয়ের মতো ভারতীয় বৌদ্ধদেরকেও নিতান্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এর অর্থ হলো এই যে, জাতীয়তাবাদের কাঁচি বৌদ্ধধর্মমত একজন ভারতীয় এবং বার্মীজের মধ্যে যে নৈতিক এবং আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তাও কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এটাই হলো জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তা খৃস্টান জাতির মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তেমনিভাবে ছিন্ন করেছে। আর বর্তমানে মুসলিম জাতির মধ্যেও ছিন্ন করছে। সিরিয়া সীমান্তে তুর্কী এবং আরবদের মধ্যে যে পরিস্থিতি দেখা গেছে তা-ও এ জাতীয়তাবাদেরই পরিণতি।

প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে এমন প্রেরণা সৃষ্টি করে, যাতে সে শক্তি অর্জন করে অন্য জাতি আর প্রজন্মকে তুচ্ছ, মূল্যহীন এবং হেয় সাব্যস্ত করত তাদেরকে দাসে পরিণত করে তাদের জন্মগত যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়ে কাজ করার সুযোগই না দেয় ; বরং তাদের বেঁচে থাকার অধিকারই হরণ করে ছেড়ে দেয়।

খোদায়ী শরীয়তের শীর্ষ মূলনীতি এই যে, শক্তির পরিবর্তে নৈতিকতার উপর মানবাধিকারের ভিত্তি স্থাপিত হোক ; এমন কি একজন শক্তিধর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকার আদায় করবে যখন নৈতিক বিধান তাতে সমর্থন জ্ঞাপন করে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে জাতীয়তাবাদ এ নীতি প্রতিষ্ঠা করে যে, শক্তিই হলো সত্য ((Might is right) এবং দুর্বলের কোনো অধিকার নেই। কারণ অধিকার আদায় করার ক্ষমতা তার নেই।

খোদায়ী শরীয়ত যেমনি নৈতিকতার সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিরোধী নয়, তেমনিভাবে তা জাতি সত্তার লালনেরও বিরোধী নয়। মূলতঃ ইলাহী শরীয়ত এজন্য সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। কারণ এক একটি জাতির স্ব স্ব স্থানে উন্নতি-অগ্রগতি সাধনের উপরই সামগ্রীকভাবে মানবতার উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু আসমানী শরীয়ত এমনভাবে জাতিকে লালন করতে চায় ; যা বৃহত্তর মানবতার (Humanity at Large) প্রতি সহানুভূতি, সহায়তা এবং কল্যাণকামিতা নিয়ে অগ্রসর হয় এবং এমন ভূমিকা পালন করে, সমুদ্রের জন্য নদী যে ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে এমন মানসিকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে সে তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ সকল যোগ্যতা-প্রতিভা কেবল স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নির্ধারণ করে নেয় এবং বৃহত্তর মানবতার সহায়ক হবে না কেবল তা-ই নয়, বরং স্বজাতির স্বার্থের বেদীতে বৃহত্তর মানবতার স্বার্থ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। ব্যক্তিগত জীবনে 'আত্মস্বার্থে'র সে স্থান, সামাজিক জীবনে সে স্থান 'জাতিপূজার'। একজন জাতীয়তাবাদী স্বভাবতই সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে। সে বিশ্বের তাবৎ রূপ-সৌন্দর্য আর গুণ-বৈশিষ্ট্য কেবল স্বজাতি আর স্ব-গোত্রের মধ্যে দেখতে পায়, অন্যান্য জাতি আর বংশ গোত্রের মধ্যে সে এমন কোনো মূল্যবান বস্তু দেখতে পায় না, যার টিকে থাকার অধিকার রয়েছে। এহেন মানসিকতার চূড়ান্ত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জার্মানীর জাতীয় সমাজতন্ত্রে। হিটলারের ভাষায় জাতীয় সমাজতন্ত্রের সংগা হলো ঃ

"যে কোনো ব্যক্তি যে জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে এতটা উর্ধে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত, যার ফলে তার কাছে স্বজাতির মঙ্গল ও কল্যাণের উর্ধে আর কোনো কিছুই থাকতে পারে না। এবং যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

Germany above all–জার্মানী সকলের উর্ধে–একথার তাৎপর্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্বে জার্মান দেশ ও জাতির চেয়ে উন্নত কোনো বস্তু তার দৃষ্টিতে প্রিয় ও সম্মানযোগ্য থাকতে পারবে না। এমন ব্যক্তিই হবে ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট।"[১]

আত্মচরিত 'আমার সংগ্রাম'-এ হিটলার লিখেন ঃ

"মহাবিশ্বে মূল্যবান যাকিছু আছে—বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং আবিস্কার-উদ্ভাবন—এসব কিছুই গুটিকতেক জাতির সৃজনশীল প্রতিভার ফলশ্রুতি। আর এসব জাতি মূলত একই বংশধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা যদি মানব জাতিকে তিনভাগে ভাগ করি—যারা সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যারা সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে এবং যারা সংস্কৃতি ধ্বংস করে—তাহলে কেবল আর্য বংশই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

এ বংশ গৌরবের ভিত্তিতেই জার্মানীতে অনার্যদের জীবন ধারণ সংকীর্ণ করে তোলা হয়। আর এরই উপর জার্মানীর বিশ্বজয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত। একজন জার্মান সোশ্যালিষ্টের মতে বিশ্বে জার্মান জাতির মিশন এই যে, সে নিম্ন শ্রেণীর জাতিকে ধ্বংসে পরিণত করতঃ সভ্যতা বিস্তারে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করবে। আর এটা কেবল জার্মানীরই বৈশিষ্ট্য নয়, গণতন্ত্রপ্রেমী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এরই ভিত্তিতে বর্ণ বৈষম্য করা হয়। শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীরা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদেরকে মানুষ বলে গণ্য করতে প্রস্তুত নয়। ইউরোপের প্রতিটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গিও এটিই। সে দেশ বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড যে কোনোটি হোক না কেন।

অতপর এ জাতি পূঁজার এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য এই দাঁড়ায় যে, এহেন জাতিপূজা মানুষকে স্বার্থপূজারীতে পরিণত করে। পৃথিবীতে শরীয়তী বিধানের আগমন ঘটেছে মানুষকে নীতিবাদীতে পরিণত করার জন্য। ইলাহী শরীয়ত মানুষের কর্মধারাকে এমন স্বতন্ত্র নীতির অনুসারী বানাতে চায়, স্বার্থ আর মনস্কামনার সঙ্গে সঙ্গে যেসব নীতির পরিবর্তন ঘটবে না, পক্ষান্তরে এর ঠিক বিপরীতে জাতিপূজা মানুষকে নীতিহীন করে তোলে। জাতিপূজারীর জন্য স্বজাতির কল্যাণ কামনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো নীতি নেই। নীতি বিজ্ঞান, ধর্মের বিধান এবং সভ্যতা দর্শন যদি এ উদ্দেশ্যে তার সহায়ক হয় তাহলে সে সানন্দে সেসব নীতির প্রতি ঈমান আনা তথা বিশ্বাস স্থাপন করার দাবী করবে। আর তা এ পথে প্রতিবন্ধক হলে সেসব বিসর্জন দিয়ে অন্য নীতি-দর্শন গ্রহণ করবে।

---

১. History of National Socialism, KonOrd Heldern-p 85
2. My struggle, London, pp 120-21

মুসোলিনীর জীবন চরিতে আমরা একজন জাতীয়তাবাদীর চরিত্রের পূর্ণ নমুনা দেখতে পাই। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সে ছিল একজন সোশ্যালিষ্ট। বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালে সে কেবল এজন্য সোস্যালিষ্টদের থেকে পৃথক হয়ে যায় যে, ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের মধ্যেই সে জাতীয় স্বার্থ নিহিত রয়েছে দেখতে পায়। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে ইটালী তার কাংখিত কল্যাণ লাভ না করতে পেরে সে নয়া ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের পতাকা উড্ডীন করে। এই নতুন আন্দোলনেও সে বারবার নীতির পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। ১৯১৯ সালে সে ছিল একজন লিবারেল সোশ্যালিষ্ট, ১৯২০ সালে হয় এনাকিষ্ট তথা স্বৈর শাসক। ১৯২১ সালে কয়েক মাস পর্যন্ত সে ছিল সোস্যালিস্ট এবং গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলোর বিরোধী ; কয়েক মাস তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। অবশেষে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নতুন নীতি গড়ে তোলে, বারবার এহেন রংবদল করা, এ নীতিহীনতা এবং এহেন স্বার্থান্বেষিতা কেবল মুসোলিনীরই একক বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটাই হলো জাতীয়তাবাদী প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনে একজন স্বার্থপর ব্যক্তি যা কিছু করতে পারে, একজন জাতীয়তাবাদী জাতীয় জীবনে ঠিক তা-ই করতে পারে। কোনো নীতি দর্শনে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু ন্যাশনালিজম এবং ইলাহী শরীয়তের মধ্যে সংঘাত সবচেয়ে খোলাখোলীভাবে আরো এক দিক থেকেও হয়। একথা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নবীই আগমন করবেন, কোনো একটা জাতি এবং কোনো একটা ভূমিতেই তিনি আগমন করবেন, কোনো এক জনপদেই তাঁর জন্ম হবে। তেমনিভাবে সে নবীকে যে কিতাব দেয়া হবে, তা অনিবার্যভাবেই সেই জনপদের ভাষায়ই হবে, যে জনপদে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অতপর সে নবুয়াতের মিশনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী সেসব স্থান সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করবে, সেসব স্থানও বেশির ভাগ সেই জনপদেই থাকবে।

কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একজন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্যবাণী এবং হিদায়াতের শিক্ষা নিয়ে আগমন করেন তা কোনো দেশ জাতির জন্য সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা সকল মানুষের জন্য থাকে সর্বব্যাপি গোটা মানবজাতিকে নির্দেশ দেয়া হয় সে নবী এবং উপস্থাপিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য। চাই কোনো নবীর মিশন সীমাবদ্ধ হোক, যেমন হযরত হূদ এবং হযরত সালেহ আলাইহিস সালামসহ আরো অনেক, অথবা তাঁর মিশন ব্যাপক হয়, যেমন হযরত ইবরাহীম এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সর্বাবস্থায় সকল নবীর প্রতি ঈমান আনতে

এবং তাঁকে সম্মান করতে সমস্ত মানুষ আদিষ্ট ছিল। যখন কোনো নবীর মিশন বিশ্বজনীন হয় তখন তো এটা স্বাভাবিক যে, তাঁর উপস্থাপিত কিতাব আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে, সে কিতাবের সাংস্কৃতিক প্রভাবও হবে আন্তর্জাতিক, তার পবিত্র স্থানসমূহ কোনো এক দেশে হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। কেবল সে নবীই নয়, বরং তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং তাঁর মিশনের প্রচার-প্রসারে শীর্ষ অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক লোকগুলো একটা জাতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জাতির মধ্যে হিরো বলে অভিহিত হবে। এসব কিছুই একজন জাতীয়তাবাদীর স্বভাব-রুচি তার আবেগ-অনুভূতি এবং তার দর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। একজন ন্যাশনালিষ্টের জাতীয়তাবোধ কিছুতেই এটা গ্রহণ করতে পারে না যে, এমন ব্যক্তিদেরকে সে হীরো হিসাবে স্বীকার করে নেবে, যে তার স্বজাতির লোক নয়, এমন স্থানকে পবিত্র বলে কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করবে, যে স্থান তার স্বদেশ ভূমির অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন ভাষার সাংস্কৃতিক প্রভাব স্বীকার করে নেবে, যা তার আপন ভাষা নয়। সে সমস্ত ঐতিহ্য দ্বারা আত্মিক প্রেরণা লাভ করবে যা বহির্দেশ থেকে আগত। এসব বিষয়কে সে কেবল বিদেশী বলে অভিহিত করবে না, বরং সে এমনই ঘৃণা আর অসহ্যের দৃষ্টিতে দেখবে, যে দৃষ্টিতে দেখা হয় বৈদেশিক হামলাকারীর সবকিছুই। স্বজাতির জীবন থেকে বাইরের সমস্ত প্রভাব দূর করার জন্য সে চেষ্টা চালাবে। তার জাতীয়তাবোধের প্রেরণার স্বাভাবিক দাবীই এই যে, সম্মান আর মর্যাদার সমস্ত আবেগ আর অনুভূতিকে সে কেবল স্বদেশ ভূমির মাটির সঙ্গেই সম্পৃক্ত করবে, স্বদেশের নদী-নালা আর পর্বতমালার প্রশংসার গান গাইবে। স্বজাতির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জীবন্ত করবে (বহিরাগত ধর্ম যেসব ঐতিহ্যকে জাহিলী যুগ বলে অভিহিত করে থাকে) আর এজন্য সে গর্ববোধ করবে। অতীতের সঙ্গে নিজের বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং নিজের পূর্বসূরীদের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের সংস্কৃতির সম্পর্ক স্থাপন করবে, স্বজাতির ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক বুযুর্গদেরকে হীরো হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের বাস্তবিক বা কাল্পনিক কীর্তি থেকে নিজের আত্মিক প্রেরণা লাভ করবে।

মোটকথা হলো এটা ন্যাশনালিজমের অবিকল স্বভাব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যে, বহিরাগত যে কোনো বস্তু থেকে বিমুখ হয়ে সে এমন বস্তুর দিকে মুখ করবে, যা তার নিজের ঘরের। এ রাস্তা যে চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছে তা এই যে, বহিরাগত ধর্মকেও চূড়ান্তভাবে বর্জন করা হবে এবং সেসব ধর্মীয় ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে তোলা হবে, যা স্বজচাতির জাহিলী যুগ থেকে কোনো জাতীয়তাবাদী লাভ করেছে। হতে পারে অনেক জাতীয়তাবাদী শেষ মন্যিল

পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না, মধ্যস্থলে কোনো মনযিলে পৌঁছে থাকবে ; কিন্তু যে পথে চলছে সে পথ সেদিকেই যায়।

অধুনা জার্মানীতে যা কিছু ঘটছে, তা জাতীয়তাবাদের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যেরই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। নাৎসীদের একটা দল তো প্রকাশ্যেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে ; কারণ তিনি ইহুদী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর কোনো ব্যক্তির ইহুদী হওয়া এজন্য যথেষ্ট যে, আর্য বংশের একজন পূজারী তাঁর সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যাবতীয় মূল্য ও গুরুত্ব অস্বীকার করবে। তাইতো এ দলের লোকেরা নির্দ্বিধায় বলে ঃ "মাসীহ ছিলেন একজন প্রোলেটারী ইহুদী। তিনি ছিলেন মার্ক্সের পূর্বসুরী। এজন্যইতো তিনি বলেছিলেন যারা নিঃস্ব সর্বহারা, তারাই পৃথিবীর ওয়ারিস হবে।" পক্ষান্তরে যেসব নাৎসীদের অন্তরে এখানো মাসীহের জন্য স্থান রয়েছে তারা তাঁকে নরডিক বংশোদ্ভূত বলে প্রমাণ করছে। যেন একজন জার্মান জাতীয়তাবাদী হয় মাসীহকে মানবেই না, কারণ তিনি ইহুদী ছিলেন; অথবা তাকে স্বীকার করলেও ইসরাঈলী মাসীহকে স্বীকার করবে না, বরং স্বীকার করবে নরডিক বংশোদ্ভূত মাসীহকে। সর্বাবস্থায় তার ধর্ম বংশপূজার অধীন। কোনো অনার্যকে আত্মিক এবং নৈতিক সভ্যতার নেতা বলে স্বীকার করে নিতে কোনো জাতিপূজার জার্মান প্রস্তুত নয়।[১] চরম সত্য কথা এই যে, জার্মান জাতীয়তাবাদীর জন্য সে খোদাও গ্রহণযোগ্য নয়, যার ধারণা আমদানী করা হয়েছে বহির্দেশ থেকে। পূরাকালে টিউটন গোত্র যেসব দেবতার পূজা করতো, কোনো নাৎসী মহল সেসবকে জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাইতো প্রাচীন ইতিহাস তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করত দেব দেবীর পূর্ণ কাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। এবং ওটন (Wotan) নামক দেবতা, প্রাচীন জাহেলী যুগে টিউটন গোত্রের লোকেরা যাকে প্লাবনের খোদা বলে স্বীকার করতো তাকেই তারা মহাদেবতা বলে স্বীকার করছে। এই ধর্মীয় আন্দোলন তো সবে মাত্র নতুন শুরু হয়েছে। কিন্তু সরকারীভাবে অধুনা নাৎসী যুবকদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাতেও খোদাকে রাব্বুল আলামীন হিসেবে নয়, বরং কেবল রাব্বুল আলমানিয়্যীন তথা জার্মানীদের খোদা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ ধর্ম বিশ্বাসের শব্দমালা এই ঃ

> "আমরা খোদার প্রতি এ হিসাবে বিশ্বাস করি যে, যিনি শক্তি ও প্রাণের আদি উৎস, পৃথিবীতে এবং সৃষ্টিলোকে.... জার্মান মানুষের জন্য খোদার

১. ঠিক এ মানসিকতা ছিল আরবের সেসব ইহুদীদের, যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল, কারণ বনী ইসরাঈল বংশে তাঁর আবির্ভাব হয়নি।

ধারণা স্বভাবজাত। খোদা আর চিরন্তনতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের ধারণার সাথে কোনোভাবেই মিলবে না। জার্মান জাতি এবং জার্মানী অনাদি বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ, শক্তি ও জীবন অনাদি বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা জীবনের ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট ধারণায় বিশ্বাসী। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য সত্য বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের নেতা এডলফে বিশ্বাস করি।"

অর্থাৎ খোদা এমন এক শক্তি ও জীবনের নাম যা জার্মান জাতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আর জার্মান জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে সে খোদার প্রকাশ। আর হিটলার হচ্ছে সে খোদার রাসূল। আর জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো সে রাসূলের উপস্থাপিত ধর্ম। একজন জাতীয়তাবাদীর মানসিকতার সঙ্গে ধর্মীয় ধারণার যদি কোনো মিল থেকে থাকে তবে তা কেবল এটাই।

পশ্চিমা ন্যাশনালিজমের পরিণতি

ইউরোপীয় নীতিতে যদি ন্যাশনালিজমের উন্নতি সাধন করা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত তা এ স্থানে এসেই দম নেবে। সেসব লোক এখনো মধ্যস্থলের মনযিলে আছে সীমা পর্যন্ত এখানো পৌছতে সক্ষম হয়নি, তাদের না পৌছতে পারার কারণ কেবল এটাই যে, এখনো তাদের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় তেমন আঘাত লাগেনি, যে আঘাত বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীকে হানা দিয়েছিল। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, তারা যখন ন্যাশনালিজমের রাস্তায় নেমেছে তখন অবশ্যই তাদের শেষ মনযিল মকসূদ হবে চরম পর্যায়ের জাহিলিয়াত, যা খোদা এবং ধর্মকে পর্যন্ত জাতীয় না বানিয়ে শান্ত হবে না। ন্যাশনালিজমের স্বভাব-প্রকৃতির দাবী এটাই। ন্যাশনালিজম অবলম্বন করে তার স্বাভাবিক দাবী থেকে কে রক্ষা পেতে পারে? ভেবে দেখুন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা অবলম্বন করা মাত্রই কোন্ বস্তুটা একজন মিসরী জাতীয়তাবাদীর গতি আপনাআপনিই মিসরের ফেরাউনদের দিকে আবর্তিত করে দেয়? যা ইরানীকে শাহনামার গল্পের নায়কদের প্রতি উৎসাহী করে তোলে? যা একজন হিন্দুস্থানীকে 'প্রাচীন সময়'-এর দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং গঙ্গা-যমুনার পবিত্রতার গান তার মুখে উচ্চারণ করায়? যা একজন তুর্কীকে তার ভাষা, সাহিত্য এবং তমদ্দুনিক জীবনের এক একটি বিভাগ থেকে আরবীয় প্রভাব দূর করতে বাধ্য করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের তুর্কী ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে। যে মন-মানসে ন্যাশনালিজমের বীজ উপ্ত হয় তার সমস্ত আগ্রহ জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং গণ্ডীর বাইরের সমস্ত কিছু থেকে সে মুখ ফিরায়ে নেয়—এ ছাড়া তার আর কি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আপনি করতে পারেন?

এ নিবন্ধ রচনা কালে আংকারার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ প্রেস-এর লেখা একটা নিবন্ধ আমার সম্মুখে রয়েছে যার শিরোনাম 'ইতিহাসে তুর্কী নারী।' নিবন্ধটির প্রাথমিক বাক্যগুলো এ রকম ঃ

"আমাদের নব উদ্ভূত গণতন্ত্র তুর্কী নারীদেরকে যে উন্নত এবং সম্মানজনক স্থান দান করতে আগ্রহী , সে সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এক নজরে আমাদের দেখা উচিত যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন যুগে তুর্কী নারীদের জীবন কেমন ছিল। এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, অধুনা তুর্কী নারী-পুরুষের মধ্যে যে সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় , তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। এ থেকে একথাও জানা যাবে যে, তুর্কী পরিবার আর তুর্কী তমদ্দুনিক ব্যবস্থা যখন বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিল তখন তুর্কী নারীরা যেকোনো তমদ্দুনিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো। আমাদের খ্যাতনামা সমাজ তাত্ত্বিক জিয়া গোক অল্প বিষয়টা নিয়ে বেশ গবেষণা করেছেন। তার গবেষণা দ্বারা এমন অনেক অধিকার সম্পর্কে জানা যায় যা তুর্কী নারীরা প্রাচীন সভ্যতার (তুরস্কের জাহিলী যুগ) অর্জন করেছিল। এসব সাক্ষ্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেকালের তুর্কী নারী আর একালের তুর্কী নারীর তমদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিক থেকে গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।"

উপরোক্ত বাক্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন। একজন জাতীয়তাবাদী তুর্কী কিভাবে তার ইতিহাসের সে অধ্যায় থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়, যে অধ্যায় তার জাতি বৈদেশিক প্রভাভাধীন হয়ে পড়ে এবং কিভাবে সে নিজের বর্তমানের জন্য অতীতকে 'উত্তম আদর্শ' হিসাবে গ্রহণ করে, যখন তার জাতি সে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। এভাবে এ জাতীয়তাবাদ মানুষের মনকে ইসলাম থেকে জাহিলিয়াতের দিকে নিয়ে যায়। গোক অল্প জিয়া মূলত যিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা, যার প্রদর্শিত পথেই অধুনা তুর্কী জাতি ধাবিত হচ্ছে। খালিদা আদীব খানমের ভাষায় তিনি হলেন ঃ

"তিনি এমন এক নতুন তুরস্ক গড়ে তুলতে চান, যা ওসমানী তুর্কী এবং তাদের তুরানী পূর্বসূরীদের মধ্যকার শূন্যতা পূরণ করতে পারে। .... ইসলাম পূর্ব যুগে তুরস্কের রাজনৈতিক এবং তমদ্দুনিক সংগঠন সম্পর্কে তিনি যেসব তথ্য সরবরাহ করেছেন তারই ভিত্তিতে তিনি তমদ্দুনিক সংস্কার সাধন করতে চান। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে, আরবরা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছে তা আমাদের অবস্থার সাথে খাপ খেতে পারে না। আমরা জাহিলী যুগের দিকে ফিরে যেতে না চাইলে

আমাদেরকে এমন এক ধর্মীয় সংস্কার করতে হবে যা আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যমীল।"

তুর্কীদের বদনাম রটাতে চায়, একথাগুলো এমন কোনো পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডাকারীর নয় বরং এগুলো একজন জাতীয়তাবাদী তুর্কী রমণীর কথা। একথাগুলোতে আপনি স্পষ্টভাবে এ দৃশ্য দেখতে পারেন যে, মুসলমানদের মন-মানসে যখন এক দিক থেকে জাতিপূজা প্রবেশ করা শুরু করে তখন কিভাবে অন্য দিক থেকে ইসলাম বের হতে শুরু করে। ব্যাপারটা কেবল তুর্কীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, যেকোনো মুসলমান জাতীয়তাবাদের শয়তানের সাথে আপোষ করবে, ইসলামের ফেরেশতার সঙ্গে তাকে বিদায়ী করমর্দন করতেই হবে। সাম্প্রতিককালে হিন্দুস্তানের জনৈক 'মুসলমান' কবি একটা স্বদেশ বন্ধনামূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। এতে তিনি ভারত মাতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

جس کا پانی ہے امرت وہ مخزن ہے تو
جس کے دانے ہیں بجلی وہ خرمن ہے تو
جس کے کنکر ہیں ہیرے وہ معدن ہے تو
جس سے جنت ہے دنیا وہ گلشن ہے تو
دیویوں دیوتاؤں کا مسکن ہے تو
تجھ کو سجدوں سے کعبہ بنا دیں گے ہم

ভাবার্থ ঃ যার পানি অমৃত, তার ভাণ্ডারতো তুমি,
যার দানা বিদ্যুৎ, তার ভাণ্ডারতো তুমি,
যার কংকর হীরা, সে খনিতো তুমি,
যার কারণে দুনিয়া স্বর্গ, সে বাগানতো তুমি,
দেব-দেবীর বাসস্থানতো তুমি,
আমরা সাজদা দ্বারা কা'বা বানাবো তোমায়।

ইসলাম এবং জাতীয়তাবাদ যে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দুটি বস্তু শেষ শ্লোকটি পাঠ করে কি সে ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকতে পারে ? বিপরীত মানসিকতার এ দুটি বস্তু এক স্থানে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মূলত ন্যাশনালিজম নিজেই একটা মযহাব যা খোদায়ী শরীয়তের বিরোধী। বরং কার্যতই জাতীয়তাবাদ মানব জীবনের সেসব দিকের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা

করার দাবী করে, খোদায়ী শরীয়ত সেসব দিক ও বিভাগকে নিজ আয়ত্বাধীন করতে চায়।[১] একজন বুদ্ধিমান লোকের জন্য কেবল একটা উপায়ই অবশিষ্ট থাকে যে, মন-মানস আর দেহ-প্রাণের দাবীদার এ দুয়ের কোনো একটাকে গ্রহণ করতঃ নিজেকে তার হাতে সঁপে দেবে এবং যখন একটার কোলে আশ্রয় নেবে তখন অন্যটার নামও মুখে উচ্চারণ করবে না।

পৃথিবী কোন্ জাতীয়তাবাদের অভিশাপে নিপতিত ?

সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগে স্বাধীনতা উন্নতি-অগ্রগতি এবং মান-মর্যাদা লাভের একটা পরীক্ষিত উপায়ই বিশ্ববাসীর জানা আছে। আর তা হলো এই জাতীয়তাবাদের ব্যবস্থাপত্র। এরই ফলে উন্নতি অগ্রগতি প্রত্যাশী জাতিমাত্রই এদিকেই ছুটে যায়। অন্যদেরকে সে দিকে ছুটে যেতে দেখে আমরাও সেদিকে ছুটে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ভেবে দেখা উচিত যে, আজ দুনিয়ার এ অবস্থা কেন হয়েছে। আজ বিশ্ব এ অবস্থায় নিপতিত কেবল এজন্য যে, ব্যক্তি এবং ব্যষ্টির আশা-আকাংখাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো শক্তি, আশা-আকাংখা আর উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বৈধ সীমার মধ্যে রাখার কোনো ক্ষমতা, চেষ্টা-সাধনার শক্তিকে সরল পথ প্রদর্শন করার মতো কোনো শক্তি, স্বাধীনতা, উন্নতি-অগ্রগতি এবং সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করার মতো সঠিক ও নির্ভুল পথ ও পন্থা নির্দেশ করার মতো যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা এবং কোনো নৈতিক জ্ঞান আজ বিশ্বের নিকট নেই। এ শক্তি আর নীতিমালার অভাবেই আজ বিশ্বের নানা জাতি বিপথগামী হয়ে পড়েছে। এ নীতি-নৈতিকতার অভাবেই আজ নানা জাতিকে অজ্ঞতা-কূপমণ্ডুকতা এবং যুলুম-অবিচারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বয়ং আমাদের দেশের হিন্দু, সিক, পারশিক ইত্যাদি জাতি আজ যে কারণে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করছে তা এই যে, তারাও এ ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এ বিপদের চিকিৎসা আর এ বিভ্রান্তির সংস্কার যদি কোথাও থাকতে পারে তা কেবল আল্লাহর বিধান। আর বিশ্বে কেবল মুসলমানরা-ই সেই দল, যারা আল্লাহর শরীয়তের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেই অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণার শিকড় কর্তন করা যা দাবানলের মতো গোটা বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের

১. প্রফেসর লিটন বলেন ঃ জাতীয়তাবাদ ধর্ম-এবং বিবেক-বুদ্ধি দুটিরই স্থান ছিনতাই করে নিয়েছে। তা মানব জীবনের সকল বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, যেমন করে থাকে ধর্ম। আজ সে জাতীয় রাষ্ট্র নামক আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করতে এবং নিজের বিবেকের বিক্রয় করত তার আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। দ্রষ্টব্য ! Social Philosophics in conflict p. 45. সামাজিক দর্শনের সংঘাত পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।

কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীকে উদ্দাত্ত কণ্ঠে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমাদের জন্য কেবল স্বাধীনতা উন্নতি-অগ্রগতি এবং মান-মর্যাদারই নয়, বরং তার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-নিরাপত্তার এবং সত্যিকার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথ কেবল তা-ই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল নিয়ে এসেছেন। শয়তানের পক্ষ থেকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ইমাম তোমাদেরকে যে পথ দেখাচ্ছে, তা সত্যিকার মুক্তি ও সমৃদ্ধির পথ নয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডী তথা বিয়োগান্ত ঘটনা এই যে, বিশ্বকে ধ্বংস ও বিভ্রান্তি-বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে পারে যে মুসলিম দলটি, বিশ্বের বুকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিশন প্রতিষ্ঠা আর প্রসারের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ যাদেরকে প্রেরণ করেছেন তারা আজ নিজেদের সে দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে বসে আছে। হিদায়াতের মশাল নিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু বিশ্বকে আলোকিত করার পরিবর্তে আজ তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর পিছু পিছু ছুটার জন্য উদ্যত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ হাসপাতালে একজন মাত্র চিকিৎসক ছিলেন, এখন সে চিকিৎসকও রোগাক্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছেন!

কবি কি চমৎকার কথা বলেছেন ঃ

مژدہ باد اے مرگ! عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

"মৃত্যুর জন্য সুসংবাদ, ইসাতো নিজেই পীড়িত।"

জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষ

পূর্ববর্তী নীতিগত আলোচনা দ্বারা আমরা প্রমাণ করেছি যে, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আঞ্চলিক জাতীয়তা ইসলামী আদর্শবাদের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব মুসলিম বলতে যদি এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার জীবনের সকল ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ রয়েছে, মুসলিম বলতে এটা ছাড়া যদি অন্য কিছু না-ই বুঝায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে আঞ্চলিক জাতীয়তার বিরোধিতা করবেই—বিরোধিতা করাই তার একান্ত কর্তব্য। তাহলে কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলে দেশভিত্তিক বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদীর ব্যাপারে মুসলমানের ভূমিকা কি হবে—কি হতে পারে—তা নিয়ে বিশেষ কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এটা সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (কিংবা বাংগালী জাতীয়তাবাদ) সমর্থন করার জন্য যখন আমাদের নিকট বার বার দাবী উত্থাপন হচ্ছে, তখন এ (অবিভক্ত) ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে জাতীয়তাবাদের পরিণাম কি হতে পারে

এবং তা দ্বারা ভারতের—তথা ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা আছে কি-না, তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

জাতীয়তাবাদের মৌল উপাদান

কোনো দেশে এক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার জন্য সেখানে পূর্ব থেকেই এক জাতীয়তা বর্তমান থাকা—আর তা না হলে তার অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা বর্তমান থাকা—একান্তই আবশ্যক। কেননা যেখানে মূলতই জাতীয়তা বর্তমান নেই, সেখানে জনগণের মধ্যে জাতি পূজার ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়। জাতীয়তাবাদের অপর নাম-ই হচ্ছে জাতিপূজার ভাবধারা। মূল স্ফুলিংগই যখন নেই, তখন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠা কিরূপে সম্ভবপর হবে ?

কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আগুন জ্বলে উঠার জন্য কি ধরনের জাতীয়তা বর্তমান থাকা আবশ্যক ?

এক প্রকারের জাতীয়তা হয় রাজনীতির দৃষ্টিতে, তাহলো রাজনৈতিক জাতীয়তা (Political Nationalism)। অর্থাৎ যারা একটি মাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন বসবাস করে তাদেরকে শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের দিক দিয়ে 'একজাতি' মনে করা যেতে পারে। এ ধরনের জাতীয়তার জন্য তাকে শরীক সব মানুষের ভাবাবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-বিশ্বাস, মতাদর্শ, তাদের নৈতিক মূল্যমান ও দৃষ্টিকোণ, তাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, তাদের ভাষা, সাহিত্য ও জীবন যাপন পদ্ধতি এবং ধারার এক ও অভিন্ন হওয়া কিছু মাত্র জরুরী নয়। এসব দিক দিয়ে সেই লোকদের বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক রাজনৈতিক জাতীয়তা বর্তমান রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। আর তারা যতদিন রাজনৈতিক ও শাসনের দিক দিয়ে এক থাকবে এ জাতীয়তার আয়ুও ঠিক ততদিন-ই টিকে থাকবে। কিন্তু তাদের বিভিন্ন সমাজ যদি বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধীও হয়ে যায়—এমনকি তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও জাতীয় প্রেরণাও যদি পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে বাস্তব চেষ্টা চালানো হয়, তাহলেও তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তা এক-ই থাকবে। এ ধরনের জাতীয়তাকে যদিও একটা জাতীয়তা নামে অভিহিত করা যায় ; কিন্তু ঠিক একজাতীয়তা সৃষ্টির জন্য যে ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত-ই মনে করতে হবে।

জাতীয়তার অপর একটি রকম হলো সাংস্কৃতিক জাতীয়তা (Cultural Nationalism) এ জাতীয়তা কেবলমাত্র সেই লোকদের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে, যাদের ধর্ম এক, চিন্তা ও মতাদর্শ, আবেগ-অনুভূতি, মূল্যবোধ এক, যাদের মধ্যে একই ধরনের নৈতিক গুণাবলী পাওয়া যাবে, যারা জীবনের

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে একই ধরনের দরদ ও দৃষ্টিভংগি পোষণ করে এবং তার প্রভাবে জীবনের সাংস্কৃতিক ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে একই ভাবধারা প্রকাশিত হবে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হারাম-হালাল ও পবিত্র-অপবিত্র প্রভৃতি নির্ধারণের মানদণ্ড একই রকম। এরা পরস্পরের অনুভূতি গভীরভাবে অনুধাবন করে, পরস্পরের স্বভাব-অভ্যাস, চরিত্র ও আগ্রহ-ঔৎসুক্যের সাথে সুপরিচিত। একজনের আনন্দে অন্যেরা আনন্দ এবং একজনের দুঃখ ও বিপদে অন্যেরা সমান দুঃখ ও বিপদ মনে করে। তাদের সমাজে রক্ত ও মনের সম্পর্ক ব্যাপক ও গভীরভাবে গড়ে উঠে। তারা একই প্রকারের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। মোটকথা, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও সামষ্টিক দিক দিয়ে তারা একদল, এক সমাজ এবং এক ও অবিভাজ্য সমাজে পরিণত হয়। লোকদের মধ্যে কেবলমাত্র এরূপ ভাবধারার দিক দিয়েই জাতীয় প্রেরণা ও উদ্বোধন সৃষ্টি হতে পারে এবং এটাই হতে পারে জাতীয়তার ভিত্তি। কেবলমাত্র এ সমাজে একটা জাতীয় রূপ, ধরন ও এক অভিন্ন জাতীয় আদর্শবাদ লালিত-পালিত ও ক্রমবিকশিত হতে পারে। এটাই উত্তরকালে একজাতীয়তা সৃষ্টি করে ও জাতীয়তার সমচেতনা (National self) জাগিয়ে তোলে। আঞ্চলিক বা দেশ-ভিত্তিক একজাতীয়তা এহেন ভাবধারার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে কিভাবে মুক্তি আসতে পারে ?

উল্লেখিত বিশ্লেষণ সামনে রেখে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যাচাই করলেই জাতীয়তাবাদের উল্লেখিত ভিত্তি এখানে বর্তমান আছে কি-না, তা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারা যাবে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাতীয়তা নিশ্চয়ই বর্তমান রয়েছে, কারণ এ দেশের অধিবাসীগণ একই শাসনব্যবস্থার অধীন জীবনযাপন করছে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর একই প্রকার আইন চালু রয়েছে এবং তাদের সকলকেই একটি মাত্র লৌহশক্তি কঠিন বাঁধনে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, নিছক রাজনৈতিক জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। এরূপ জাতীয়তা অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, বৃটেন, আয়ারল্যাণ্ড এবং আরো অনেক সাম্রাজ্যেও বর্তমান ছিল। এখনো অনেক দেশে তা বর্তমান রয়েছে। কিন্তু তা কোনো দেশে 'জাতীয়তাবাদের' সৃষ্টি করেনি। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া কিংবা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবতে সমভাগী হওয়ার কারণেও জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয় না। মূলত একমাত্র সাংস্কৃতিক জাতীয়তাই সঠিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে পারে। আর প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই এক দৃষ্টিতে বুঝতে পারে

যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক জাতীয়তার অস্তিত্ব আদৌ বর্তমান নেই।

প্রকৃত ব্যাপার যখন এটাই, তখন জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করে লাভ কি? যেখানে মা'রই কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে সন্তানের উল্লেখ নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কি হতে পারে! আর এতদসত্ত্বেও যারা এ দেশে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে, তাদের একথা ভাল করেই জেনে নেয়া আবশ্যক যে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তার গর্ভেই এ 'সন্তানে'র জন্ম হতে পারে। এবং তার জন্মের পূর্বে তার মায়ের জন্ম হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ তত্ত্ব জেনে নেয়ার পর তাদের দাবী পরিবর্তন করা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষে এ জাতীয়তার নাম নেয়ার পূর্বেই তাদেরকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম কিছুতেই সম্ভব নয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কিরূপে সৃষ্টি হতে পারে?

অতপর ভারতবর্ষে এক সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী।

বস্তুত যে দেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তা রয়েছে, তথায় এক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মাত্র দুটি উপায়ই হতে পারে :

এক : একজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি অন্যান্য সকল জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে। অথবা

দুই : সকলের পারস্পরিক নিবিড় মিলন ও সংমিশ্রণের সাহায্যে এক সর্বজাতীয় ও সম্মিলিত সভ্যতার সৃষ্টি করা হবে।

প্রথম উপায়টি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক। কারণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতৃবৃন্দ সেরূপ করাকে নিজেদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেননি। তবে যারা 'হিন্দু জাতীয়তা' কিংবা 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'[১]

১. 'মুসলিম' ও জাতীয়তাবাদের এ সংমিশ্রণ বাহ্যত বিস্ময়কর বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিস্ময়কর দুনিয়ায় এরূপ আশ্চর্যজনক ব্যাপারও ঘটে থাকে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে (বিভাগ পূর্বকালে) দুই প্রকার 'জাতীয়তাবাদী' লোক বর্তমান ছিল প্রথম 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম'। অর্থাৎ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যারা ভারতে মিশ্র একজাতীয়তা সৃষ্টির পক্ষপাতী এবং তারই পূজারী। আর দ্বিতীয়–'মুসলিম জাতীয়তাবাদী'। এ শব্দ থেকে সেইসব লোক বুঝায়, যাদের কাছে ইসলামের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতি-বিধানের কোনোই গুরুত্ব নেই, কিন্তু কেবল মুসলমানী নাম হওয়ার দরুন এক জাতিতে শরীক হয়েছে। তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তার স্বাতন্ত্র্য (Individualism) সম্পর্কে তাদের কৌতূহল শুধু এ জন্য যে, তারা এ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ উভয় প্রকার জাতীয়তাবাদীই সমানভাবে ভ্রান্ত। ইসলাম কেবল 'সত্যবাদ' বা আদর্শবাদকেই সমর্থন করে, অন্য কোনো

সৃষ্টি করতে চান, তারা এ উপায় অবলম্বন করতে পারেন। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ কেবলমাত্র দ্বিতীয় উপায়ই অবলম্বন করতে পারেন। এজন্য এ দেশের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এক নবতর জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য তারা প্রায়ই আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু তাদের বালকোচিত কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তারা সাংস্কৃতিক জাতীয়তার প্রকৃত অর্থ মাত্রই বুঝতে পারেননি। এই প্রকার জাতীয়তাসমূহের সংমিশ্রণ কোন্ নিয়মনীতি অনুসারে হতে পারে, সেই সম্পর্কেও তারা মাত্রই অবহিত নন। আর এরূপ সংমিশ্রণ সাধনের ফলে কোন্ ধরনের জাতীয়তা রূপ লাভ করতে পারে, সে বিষয়েও তাদের ধারণা নেই। এ কাজকে তারা 'ছেলে খেলা' বলে মনে করেন, আর নিতান্ত ছেলেদের মতোই এ ক্রীড়া তারা খেলতে চান।

বস্তুত একটি জাতির বুদ্ধি, প্রকৃতি ও নৈতিক ব্যবস্থারই নাম হচ্ছে সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। আর এরূপ জাতীয়তা এক-দুদিনে কখনই রূপ লাভ করতে পারে না। কয়েক শতাব্দীকাল ধরে ক্রমাগতভাবে তার বিকাশ ঘটে থাকে। কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত কিছুসংখ্যক লোক যখন বংশানুক্রমিক-ভাবে একই প্রকার ধারণা, বিশ্বাস, প্রথা ও রীতিনীতির অধীন জীবনযাপন করে, তখনি তাদের মধ্যে এক মিলিত ও সর্বসম্মত ভাবধারার সৃষ্টি হয়, সম্মিলিত নৈতিক গুণাগুণ সুদৃঢ় হয়, এক বিশিষ্ট বুদ্ধি-প্রকৃতি গড়ে ওঠে। যেসব ঐতিহ্যের সাথে তাদের মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস (Sentiments) সংযোজিত থাকে, তাই অত্যন্ত গভীর হয়ে বসে। তাদের মন ও মস্তিষ্কের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা ফুটে ওঠে তাদের সাহিত্যে। তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক ঐক্যরূপে গড়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুতা ও সমঝোতার (Mutual Intelligibility) সৃষ্টি হয়। এসব গভীর ও সুদৃঢ় প্রভাবের দরুন যখন কোনো দলে স্বতন্ত্র জাতীয়তা গড়ে ওঠে—অন্যথায় তার নৈতিক ও বুদ্ধিগত প্রকৃতি যখন সুদৃঢ় হয়, তখন অন্য কোনো দলের

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

প্রকার 'বাদ'কে আদৌ সমর্থন করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ উভয় প্রকার জাতীয়তাবাদীই নিজেদের এ অনৈসলামিক নীতি সম্পর্কে মাত্রই সচেতন নয়। বিশেষত দ্বিতীয় প্রকারের লোকগণ নিজেদেরকে ইসলামের পতাকাবাহী বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের ও 'হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' হিন্দু-জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে বলে হিন্দু নামে পরিচিত লোকদের কল্যাণ সাধনই তার লক্ষ্য। এদের কারো কাছে কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য ও কোনো নীতিগত আদর্শ বর্তমান নেই। মুসলমান নামের লোক ক্ষমতার আসনে আসীন হলেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি খুশী ও নিশ্চিন্ত হতে পারে। তার সরকার সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী নীতি অনুসারে কাজ করলেও তাতে কোনো আপত্তি থাকে না। তার যাবতীয় কাজকর্ম একজন অমুসলমানের কাজকর্মের অনুরূপ হলেও তাতে কোনোরূপ দোষ নেই।

সাথে সংমিশ্রিত হয়ে অন্য কোনো জাতীয়তায় রূপান্তরিত হওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ দল শত শত বছর কাল পর্যন্ত একই আবহাওয়ায়, পরিবেশে ও একই ভূ-খণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করে ; কিন্তু তবুও এদের কোনোরূপ সংমিশ্রণের সৃষ্টি হয় না। ইউরোপে জার্মান, মগিয়ার, পোল, চেক, ইহুদী, সালাফী এবং এ প্রকারের অন্যান্য অনেক জাতি দীর্ঘকাল ধরে একই স্থানে জীবনযাপন করছে ; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সংমিশ্রণের সৃষ্টি হয়নি। ইংরেজ ও আইরিশ যুগ-যুগান্তকাল একই সাথে বাস করছে ; কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রকার মিলন সৃষ্টি হয়নি। কোনো কোনো দেশে এ প্রকার জাতিসমূহের ভাষা এক হলেও তাদের মন ও হৃদয়ে কোনো দিক দিয়েই সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়নি। শব্দ এক হতে পারে, কিন্তু তা প্রত্যেক জাতির হৃদয়-মনে স্বতন্ত্র ভাবধারা ও মতবাদের প্রবাহ জাগায় যা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের নৈতিক বিধান ও বুদ্ধি-প্রকৃতির মধ্যে যদি বিরাট কোনো পার্থক্য না থাকে, বরং তা যদি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র বিশিষ্ট হয়, তবে তখনই একত্রে বসবাস ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে এ ধরনের দলগুলোর পরস্পর মিলিত একটি খাঁটি, পরিপূর্ণ ও যুক্ত জাতীয়তার সৃষ্টি করা সম্ভব। এ অবস্থায় তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা নিঃশেষে মিলে যায়। তখন এক সর্বদলীয় নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু এ কাজ নিমেষ মাত্র সময়ের মধ্যে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল ধরে বহু ভাঙা-গড়া ও ঘাত-প্রতিঘাতের পরই বিভিন্ন অংশের পরস্পর মিলিত হওয়ার ফলে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতি জেগে ওঠে। ইংল্যাণ্ডে ব্রাইটন, হেকসন ও নারমণ্ডী জাতিসমূহের এক জাতিতে পরিণত হতে শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। ফ্রান্সে দশ শতাব্দী থেকে এ কাজ চলছে। কিন্তু এখনও জাতীয়তার উৎসমূলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। যেসব বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ইটালীয় জাতীয়তার রূপায়ণ হয়েছে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তারা পরস্পর বিরোধী না হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তথায় জাতীয় ভাবধারার সৃষ্টি হতে পারেনি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেবল তাদের নিয়েই 'একজাতি' সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, যারা প্রায় সকল দিক দিয়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র সম্পন্ন এবং যারা স্বার্থের সামান্য দ্বন্দ্ব পরিহার করে অনতিবিলম্বে 'একজাতি' হতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন হতে দু-তিন শতাব্দীকাল অতীত হয়েছে।

একই প্রকার চরিত্র সমন্বিত জাতিসমূহের পারস্পরিক সংমিশ্রণে একটি বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতীয়তার সৃষ্টি কেবল এজন্যই সম্ভব হয়ে থাকে যে, এ সংমিশ্রণ কার্য সম্পন্ন করার সময় তাদেরকে নিজেদের মতবাদ, বিশ্বাস ও

নৈতিক মানদণ্ড পরিহার করা এবং নিজেদের উচ্চ ও উন্নত নৈতিক গুণাবলীর মূলোৎপাটন করার কোনোই আবশ্যক হয় না। বরং এসব জিনিসই তাদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে। কেবল ঐতিহ্য-ইতিহাসের রদ-বদল এবং আবেগ, উচ্ছ্বাস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Readjustment) দ্বারাই তাদের এ নবতম জাতীয়তা স্থাপিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, যেখানে বিভিন্ন প্রকার নৈতিক চরিত্র বিশিষ্ট জাতিসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার কৃত্রিম চাপ, কোনো প্রকার অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা এবং কোনো সাধারণ কারণে এ সংমিশ্রণ সাধিত হয়, সেখানে সর্বাপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট জাতীয়তাই গড়ে ওঠে। কারণ, এমতাবস্থায় তাদের মতবাদের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে যায়। তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র—যার স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের দরুন আজ পর্যন্ত সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়। তাদের জাতীয় সত্তার অনুভূতি—যার ভিত্তিতে তার জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—খতম হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার মানদণ্ড পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের নতুন জাতীয়তা তাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক পংকিলতার একটি সমষ্টিতে পরিণত হয়। এ ধরনের সংমিশ্রণে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অতপর নবতর নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হয়। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। নিজ নিজ জাতীয় ধরনকে তারা নিজেরাই চুরমার করে—কিন্তু নতুন জাতীয় ধরন তৈরি করতে বহুকাল অবকাশের আবশ্যক হয়।

যারা এরূপ মারাত্মক পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হবে, তাদের প্রকৃতি কখনই মযবুত হতে পারে না, তারা হবে হীন চরিত্র, সংকীর্ণমনা, উদ্দীপনাহীন ও নীতিহীন। যে পত্রটি বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে ঝরে পড়েছে, তার যেমন কোনোরূপ স্থিতি নেই—বায়ুর প্রত্যেকটি প্রবাহে তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গড়াতে থাকে, ঐসব জাতির প্রকৃত অবস্থা সেরূপই হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বিভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট জাতিসমূহের পারস্পরিক সংমিশ্রণের পরিণতি যারা দেখেছে, তারা প্রত্যেকেই একবাক্যে সাক্ষ দেয় যে, এর ফলে সংশ্লিষ্ট জাতি-সমূহের নৈতিক সৌন্দর্য একেবারেই খতম হয়ে গেছে এবং এর দরুন সেই দেশের অধঃস্তন পুরুষ জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক চরিত্র ও দেহ-সংস্থার দিক দিয়ে একেবারে নিকৃষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করছে।

সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক স্বার্থপরতার উর্ধে থেকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশে সক্ষম কোনো ব্যক্তিই

পাক-ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতিসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র বিশিষ্ট বলে মনে করতে পারে না। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তার মধ্যে যতখানি বৈষম্য রয়েছে, পাক-ভারতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে উদয়-তোরণ ও অস্ত-গগনের দূরত্ব রয়েছে। এ দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতিসমূহ পরস্পর বিরোধী, ঐতিহ্যসমূহের উৎসমূল সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। অভ্যন্তরীণ হৃদয়াবেগ ও ভাবধারা পরস্পর বিরোধী। একটি জাতির জাতীয় ধরনের সাথে অন্য জাতির জাতীয় ধরনের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। নিছক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য এ বিভিন্ন জাতীয়তাকে নির্মূল করে একটি যুক্ত জাতীয়তা সৃষ্টি করার পরিণাম পূর্ব বর্ণিত কারণে মারাত্মক হবে। দুর্ভাগ্যবশত দেড় শতাব্দী কালের বৃটিশ প্রভুত্ব ভারতের জাতিসমূহকে পূর্ব থেকেই নৈতিক চরিত্রহীনতার গভীরতর পংকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। দাসত্বের খুন তাদের মনুষ্যত্ববোধকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্রের ভয়ানক পতন ঘটেছে। অধঃস্তন পুরুষের মধ্যে এ মারাত্মক পতন সর্বগ্রাসী কুফল এনে দিয়েছে। এ সংকট মুহূর্তে নতুন জাতিগঠনের কাজ শুরু করার জন্য তাদের ধ্বংসাবশিষ্ট সংস্কৃতির ভিত্তিতে আঘাত হানলে সমগ্র দেশের নৈতিক-বাঁধন আকস্মিকভাবে ছিন্নভিন্ন হবে এবং তার পরিণাম খুবই ভয়াবহ!

পাক-ভারতের কোনো কল্যাণকামীই কি একজাতীয়তা সমর্থন করতে পারে ?

এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, বৈদেশিক শক্তির গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য এ দেশে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। আর জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একজাতীয়তা। কাজেই বর্তমানের সকল জাতীয়তাকে নির্মূল করে এক সর্বদলীয় জাতীয়তা গঠন করা আবশ্যক। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের এ চিন্তা একেবারেই অমূলক। তাদের মধ্যে যদি নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি বর্তমান থাকতো এবং পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যদি তারা চিন্তা করতে চেষ্টা করতেন, তবে তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারতেন যে, একজাতীয়তার পথে পাক-ভারতের বিন্দুমাত্র মুক্তি নেই—আছে মারাত্মক ধ্বংস ও বিলুপ্তি।

প্রথমত, এ পথে জাতীয়তা লাভ করতে দীর্ঘকাল সময় লাগবে। শত-সহস্র বছরের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তা গড়ে উঠেছে, তা নির্মূল করে তদস্থলে এক নবতর জাতীয়তা গড়ে তোলা এবং এ নতুন জাতীয়তা

মযবুত ও সক্রিয় হয়ে এক জাতীয়তা পর্যন্ত উপনীত হওয়া মাত্রই সহজসাধ্য নয়। সে জন্য দীর্ঘকালের দরকার হবে।

দ্বিতীয়ত এ পথে জাতীয়তা লাভ হলেও শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশের চরম নৈতিক চরিত্রহীনতা নিম্নতম পংকে নিমজ্জিত হওয়ার নিশ্চিত আশংকা রয়েছে।

তৃতীয়ত যেসব জাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী, তারা এ ধরনের একজাতীয়তা সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে আযাদী যুদ্ধের জন্য কোনো যুক্ত প্রচেষ্টা গড়ে ওঠা সম্ভব হবে না। ফলে বৈদেশিক শাসন-নিগড় থেকে মুক্তিলাভও সুদূরপরাহত হবে। এমনকি, এ পথে চেষ্টা করলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরতরে ম্লান হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণে যারা জাতীয়তাবাদকেই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র অস্ত্র বলে মনে করে, আমার মতে—তারা নির্বোধ ও অজ্ঞ। আমি পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি ঃ ভারতের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের মূলত-ই কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যে দেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বর্তমান রয়েছে, সেখানে একজাতীয়তার জন্য চেষ্টা করা কেবল বাহুল্য মাত্রই নয়, নীতি হিসাবে তা মারাত্মক ভুলও বটে। উপরন্তু পরিণামের দিক দিয়ে তা কিছুমাত্র কল্যাণকর না হয়ে বিরাট অকল্যাণেরই সৃষ্টি করবে, সন্দেহ নেই।

ফিরিংগী পোশাক

মাওলানা সিন্ধী ভাষণের শেষাংশে মুসলমানদেরকে হাফপ্যান্ট, কোট-পাতলুন ও হ্যাট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এ আলোচনার শেষভাগে আমি এ সম্পর্কেও আলোচনা করতে চাই।

প্রাচ্যের এ জাতীয়তাবাদীরা এক আশ্চর্য ধরনের জীব। একদিকে তারা জাতীয়তাবাদের প্রবল প্রচার চালাচ্ছে, অন্যদিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের পোশাক ও তামাদ্দুনিক রীতিনীতি গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করছে না। শুধু তাই নয়, ভিন্ন জাতির পোশাক ও তামাদ্দুনিক রীতিনীতিকে নিজেদের জাতির মধ্যে প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে তাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক অনিবার্য কার্যসূচী হিসেবেই গ্রহণ করার জন্যও তারা চেষ্টা করছে। এমনকি, যেখানে শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব, সেখানে বলপূর্বক এটা দেশবাসীর মাথার

ওপর চাপাতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষ, ইরান, মিসর, তুরস্ক—সর্বত্রই জাতীয়তাবাদীদের এ একই অবস্থা। অথচ জাতীয়তাবাদ—এ শব্দে জাতীয় সম্মানবোধের ভাব কিঞ্চিৎমাত্রও যদি বর্তমান থেকে থাকে, তবে প্রত্যেক জাতিরই নিজ জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সভ্যতা তামাদ্দুনের ওপর সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও তাতেই আত্মমর্যাদা অনুভব করা এবং তা নিয়ে গৌরব করাই কর্তব্য। আর যেখানে জাতীয় সত্তার বিন্দুমাত্র অনুভূতি বর্তমান নেই সেখানে জাতীয়তাবাদ কোথা থেকে আসবে ? জাতীয় স্বকীয়তাবোধের বিলুপ্তি এবং জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশীয় জাতীয়তা-বাদীগণ এ পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সংমিশ্রণ সাধনে সিদ্ধহস্ত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, চিন্তা ও কাজের বৈষম্য ও বিরোধ থেকে বাঁচার জন্য অনাবিল সুস্থ মানসিকতা এবং সংস্কারমুক্ত উদার উচ্চ দৃষ্টি আবশ্যক। আর এটাই যদি কেউ লাভ করতে পারে, তবে প্রকৃতির সহজ-সরল পথ পরিত্যাগ করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তার হবে না।

সর্বোপরি তাদের এ নীতির প্রতি ইসলামের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহজ-সরল, ঋজু, আড়ম্বরহীন অকৃত্রিম পন্থারই নাম হচ্ছে ইসলাম। জাতীয়তার সীমালংঘনকারী বাড়াবাড়ি যেমন ইসলামের মনঃপূত নয়, তেমনি জাতীয়তার সংগত ও স্বাভাবিক সীমাভংগকারী, জাতি-সমূহের স্বাতন্ত্র্য (Individuality) ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সমূহ নিশ্চিহ্নকারী এবং তাদের মধ্যে পংকিল কলুষ চরিত্র সৃষ্টিকারী কোনো জিনিসকেও ইসলাম মাত্রই বরদাশত করতে পারে না।

কুরআন শরীফ ঘোষণা করেছে ঃ মানুষ যদিও একই মূল থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মাত্র দু প্রকারের পার্থক্য সৃষ্টি করার অবকাশ রেখেছেন। প্রথম স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং দ্বিতীয় বংশ, গোত্র ও জাতীয়তার পার্থক্য।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط - الحجرات : ١٣

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একই স্ত্রী-পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি—শুধু এজন্য যে, যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার।"

—সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝ - النجم : ٤٥

"এবং আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও স্ত্রী এ দুটি লিংগ বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"—সূরা আন নাজম ঃ ৪৫

বস্তুত এ উভয় প্রকার পার্থক্য সৃষ্টিই মানব সভ্যতা ও সামাজিক জীবন ধারার মূলভিত্তি। অতএব একে যথাযথভাবে বজায় রাখাই হলো আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক মনের টান ও আকর্ষণ-শক্তি জাগ্রত করার জন্যই এদের মধ্যে লিংগগত পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই সমাজ ও বিশাল তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে উভয়েরই স্বাভাবিক গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংরক্ষিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। অপরদিকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে তামাদ্দুনিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য তাদের এক একটি সামাজিক পরিবেষ্টনী ও ক্ষেত্র তৈরি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিধায় জাতিসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য রক্ষা করা দরকার। এজন্যই প্রত্যেক মানব দল বা সমাজ ও তামাদ্দুনিক পরিবেষ্টনীর কিছু না কিছু পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ হওয়া অপরিহার্য। এর ফলে একই পরিবেষ্টনীর মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারবে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ভালবাসার সৃষ্টি হতে পারবে, পরস্পরকে অনুধাবন করতে পারবে। আর অন্যান্য পরিবেষ্টনীর মানুষ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারবে। অতএব এতে আর কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভাষা, পোশাক, জীবন যাত্রার ধারা ও তামাদ্দুনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ পার্থক্য রক্ষাকারী উপাদান। এদের যথাযথ সংরক্ষণ প্রকৃত স্বভাব-নীতিরই দাবী।

ঠিক এ কারণেই ইসলামে 'তাশাব্বুহ' (تَشَبُّه অর্থাৎ পরের সাথে নিজেকে পুরোপুরি মিলিয়ে দেয়া বা নিজেকে অপরের বাহ্যিক বেশে সজ্জিত করা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ পুরুষের পোশাক পরিধানকারিণী স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধানকারী পুরুষের ওপর নবী করীম স. অভিসম্পাত করেছেন।[১] অপর একটি হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ স্ত্রীলোকের বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের বেশ ধারণকারিণী স্ত্রীলোকদেরকে নবী করীম স. অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন।[২] এর একমাত্র কারণ এই যে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মনের যে টান ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, পরস্পরের বেশ পরিবর্তনের ফলে অনিবার্যরূপে তা নিভে যায়। আর ইসলাম তা স্বয়ং মানবতার সংরক্ষণের জন্য

---

১. আল-মুস্তাদরাক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-১৯৪।
২. বুখারী শরীফ, পোশাক অধ্যায়।

বাঁচিয়ে রাখতে চায়। অনুরূপভাবে জাতিসমূহের পারস্পরিক পোশাক, তামাদ্দুন ও প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন করা বা পরস্পর অদল-বদল করে কোনো মিশ্র সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সামাজিক শান্তি, স্থৈর্য, স্বার্থ ও কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্যই ইসলামও তার বিরোধিতা করে। জাতীয় স্বকীয়তাকে তার স্বাভাবিক সীমালংঘন করে জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজায় পরিণত করলেই ইসলাম তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। কারণ, তার ফলেই জাহেলী অহমিকা, অত্যাচারমূলক হিংসা-দ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইসলামের শত্রুতা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বা জাতি পূজার বিরুদ্ধে—জাতীয়তার (Nationality) বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাকে রক্ষা করতে চায় এবং তাকে ধ্বংস করার ততদূরই বিরোধিতা করে, যতদূর বিরোধিতা করে তার স্বাভাবিক সীমালংঘন করে যাওয়া। এজন্য ইসলাম যে মধ্যম ও ভারসাম্যমূলক পন্থা গ্রহণ করেছে, তা অনুধাবন করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ লক্ষণীয় ঃ

এক ঃ একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, স্বজাতি পূজা বা জাতি-বিদ্বেষ কাকে বলে ? নিজ জাতিকে ভালবাসাও কি জাতি বিদ্বেষ ? উত্তরে নবী করীম স. বললেন—'না, যুলুমের কাজেও নিজ জাতির সহযোগিতা করার নামই হচ্ছে স্বজাতি পূজা।—ইবনে মাজা

দুই ঃ রাসূলে করীম স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যে জাতির বেশ ধারণ করবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।–আবু দাউদ

তিন ঃ হযরত ওমর ফারুক রা. আজারবাইজানের গভর্নর উতবা বিন ফরকদকে লিখেছিলেন ঃ"সাধারণ মুশরিক (অর্থাৎ আজারবাইজানের অধিবাসীদের) পোশাক পরিধান করবে না।"–কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাহ্

চার ঃ হযরত ওমর রা. রাজ্যের সমস্ত অমুসলিম অধিবাসীকে আরবদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য তার সকল গভর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি, কোনো কোনো এলাকার বাসিন্দাদের সাথে সন্ধি করার সময় "তোমরা আমাদের পোশাক পরিধান করবে না" বলে একটি স্বতন্ত্র শর্তই যথারীতি চুক্তিপত্রে লিখিত হতো।

–কিতাবুল খারাজ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ।

পাঁচ ঃ যেসব আরববাসী সামরিক কি রাষ্ট্রীয় কার্যোপলক্ষে ইরাক ইরান প্রভৃতি দেশে মোতায়েন ছিলেন, হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা. তাদেরকে নিজেদের ভাষা ও কথা বলার ভাব-ভংগী সংরক্ষণ করতে এবং অনারবের ভাষা ও ভংগী গ্রহণ না করতে বারবার নির্দেশ পাঠাতেন।–বায়হাকী

এ নির্দেশসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম যে ধরনের আন্তর্জাতিকতার ধারক, তা জাতিসমূহের স্বকীয় পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন করে একটি জগাখিচুড়ী সৃষ্টির পক্ষপাতি নয়। বরং তা জাতিসমূহকে তাদের জাতীয়তা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহকারে স্থায়ী রেখে তাদের মধ্যে সভ্যতা, কৃষ্টি, সৌজন্য, নৈতিক-চরিত্র ও মতবাদ-চিন্তাধারার এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধনের সৃষ্টি করতে চায়, যার দরুন আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, টানাহেচড়া, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রতিবন্ধকতা, অত্যাচার ও হিংসা-দ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের নির্মল ভাবধারা পরিস্ফুটিত হবে। 'তাশাব্বুহ' বা পরানুকরণের আরো একটি দিক রয়েছে, যে জন্য ইসলাম তার প্রচণ্ড বিরোধী। একটি জাতি নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল তখনি ত্যাগ করতে পারে, যখন তাদের মধ্যে কোনো মানসিক দুর্বলতা ও নৈতিক শিথিলতা দেখা দেয়। পরের প্রভাবে যে ব্যক্তি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে এবং পরের রঙে নিজেকে রঞ্জিত করে, তার মধ্যে নীচতা-হীনতা, বহুরূপী ভাব, খুব শীঘ্র প্রভাবিত হওয়ার দুর্বলতা ও দায়িত্বহীন কার্যকলাপের মারাত্মক রোগ অনিবার্যরূপে বর্তমান থাকবেই ; আর সাথে সাথেই এ রোগের চিকিৎসা করা না হলেই তা বৃদ্ধি পাবে ও সংক্রমিত হবে। আর বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে এ রোগ সংক্রমিত হলে গোটা জাতিই মানসিক দুর্বলতায় নিমজ্জিত হবে। তার নৈতিক চরিত্রে দৃঢ়তা ও বীর্যবত্তা বলতে কিছুই থাকবে না। তার মনের ওপর নৈতিক চরিত্রের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তিই স্থাপিত হতে পারবে না। কাজেই ইসলাম কোনো জাতিকেই নিজের মধ্যে এরূপ মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি করার অনুমতি দেয়নি। কেবল মুসলমানদেরই নয়, তার ক্ষমতায় হলে অমুসলমানদেরও এ মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কারণ ইসলাম কোনো মানুষের মধ্যেই নৈতিক দুর্বলতা দেখতে মাত্রই প্রস্তুত নয়।

বিশেষ করে বিজিত ও অধিকৃত লোকদের মধ্যে এ রোগ খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। কেবল নৈতিক দুর্বলতাই নয়, তাদের মধ্যে এমন মারাত্মক মনোভাবও দেখা দেয়, যার ফলে তারা নিজেদেরকেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বলে মনে করতে থাকে, সকল দিক দিয়েই নিজেদেরকে হীন ধারণা করতে শুরু করে এবং শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ অনুকরণ করেই সম্মান ও মান-মর্যাদা লাভ করতে চায়। কারণ ইয্যত, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শরাফত, সভ্যতা-সংস্কৃতি—প্রত্যেকটিরই আদর্শ নমুনা তারা তাদের শাসকদের মধ্যেই দেখতে পায়। দাসত্ব তাদের মনুষত্বকেই ধ্বংস করে, অতপর অপমান, লাঞ্ছনা, হীনতা ও নীচতার শরীরি বিজ্ঞাপন থেকেও তাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ

হয় না ; বরং তাতে লজ্জার পরিবর্তে গৌরবই বোধ করে।[১] ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার নীচতা-হীনতার গভীর পংক থেকে উদ্ধার করে মনুষত্বের উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে চায় ; কাজেই কোনো মানবগোষ্ঠীকেই তা অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে দেখতে মাত্রই প্রস্তুত নয়। হযরত ওমর ফরুক রা.-এর খেলাফতকালে বহু অনারব জাতি যখন ইসলামী হুকুমাতের অধীন হতে লাগলো, তখন তিনি তাদেরকে আরবদের অনুকরণ করতে তীব্রভাবে নিষেধ করে দিলেন। এ জাতিগুলোর মধ্যে দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি জাগ্রত হলে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। হযরত মুহাম্মাদ স. জাতিসমূহের মনিব-প্রভু সাজার জন্য আরবদের হাতে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেননি।

এসব কারণেই একটি জাতির অন্য জাতির হুবহু নকল করে চলার এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাপন পদ্ধতি অনুকরণ করার প্রচেষ্টাকে ইসলাম মাত্রই সমর্থন করেনি। তবে তাহযীব-তামাদ্দুনের পারস্পরিক লেনদেনের—পারস্পরিক সম্পর্ক-সংশ্রব রাখার দরুন বিভিন্ন জাতির মধ্যে যা হওয়া অনিবার্য—ইসলাম মাত্রই তার বিরোধী নয়—বরং এর উৎকর্ষ সাধনই তার লক্ষ্য। নিজেদের তামাদ্দুনের মধ্যে অন্য জাতির কিছুই গ্রহণ করবো না—এরূপ হিংসা-বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিরাট প্রাচীর খাড়া করা ইসলামের অভিপ্রেত নয়। নবী করীম স. সিরিয়া দেশের 'জুব্বা' (Overcoat) পরিধান করেছেন—অথচ তা ইহুদীদের পোশাকের একটি অংশ। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ "নবী করীম স. অযু করলেন এবং তাঁর গায়ে সিরিয়া দেশের একটি জুব্বা ছিল।" তিনি সংকীর্ণ হাতাওয়ালা রোম দেশীয় জুব্বাও ব্যবহার করেছেন। অথচ এটা রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানরাই পরতো। নওশেরাওয়ানী 'ক্বাবাও' তিনি ব্যবহার করেছেন। হাদীসে তা جُبَّةٌ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَةٌ নামে উল্লেখ হয়েছে। হযরত ওমর রা. 'ব্রবুরনুস' নামী

১. একথার সত্যতার প্রমাণ সর্বত্র বিরাজিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে মুষ্টিমেয় ইংরেজ-ই বসবাস করতো। তারা কোথাও একত্রেও বাস করতো না, ছিন্নভিন্নভাবেই তারা থাকতো, কিন্তু আড়াই শত বছর পর্যন্ত তারা এ দেশীয় লোকদের মধ্যেই থেকে গেছে। কিন্তু ভারতীয় পোশাক পরিধান করেছে এমন একজন ইংরেজও কোথাও দেখা যায়নি। অথচ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না, যারা আপাদমস্তক ইংরেজ সাজতেই চেষ্টা করেছে—এখনো করছে। কেবল পোশাক-পরিচ্ছদেই নয়, কথাবার্তা, চলাফেরা, আদব-কায়দা, পেশাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া—সব ব্যাপারেই তারা পুরোপুরিভাবে ইংরেজের অনুকরণ করে চলেছে। এর কারণ কি, তা ভেবে দেখেছেন কি ?

এক প্রকার উঁচু টুপী পরিধান করেছেন—এটা খৃস্টান দরবেশের পোশাকেরই একটি অংশ ছিল। এ থেকে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের বিভিন্ন বংশগত পোশাক ব্যবহার করলে তাতে 'তাশাব্বুহ' হয় না। মূলত ব্যক্তির সমগ্র বেশভূষা ভিন্ন জাতির অনুরূপ হলেই এবং তাকে দেখে তার জাতীয়তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা করা কঠিন হলেই তখন 'তাশাব্বুহ' হয় এবং তা-ই ইসলামে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পারস্পরিক লেনদেন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। একটি জাতি অন্য জাতির কোনো ভাল কিংবা অবস্থানুকূল 'জিনিস' নিয়ে নিজের বেশভূষার মধ্যে গণ্য করলে তাতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ তাতে তার জাতীয় বেশভূষা সমষ্টিগতভাবেই বর্তমান থাকে।[১]—তরজুমানুল কুরআন ঃ ১৯৩৯ইং

১. বিস্তারিত জানার জন্য ঃ تفهيمات حصه دوم দ্রষ্টব্য।

ইসলামী জাতীয়তার তাৎপর্য

বর্তমান যুগে গোটা মুসলিম সমাজের জন্য 'কওম' বা জাতি শব্দটি খুব বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের সামগ্রিক রূপকে বুঝাবার জন্য সাধারণত এ পরিভাষাটিই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরআন হাদীসে 'কওম' (জাতি বা Nation অর্থে অন্য কোনো) শব্দকে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো মহল এ ভ্রান্ত মতের সুযোগে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করছে। ইসলাম 'কওম' বা জাতি শব্দটি মুসলমানকে বুঝাবার জন্য কেন ব্যবহার করেনি এবং তার পরিবর্তে কুরআন হাদীসে কোন্ শব্দ অধিকতর ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে আমি সংক্ষেপে তাই আলোচনা করতে চাই। বস্তুত এটা নিছক কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনা মাত্র নয়, যেসব ধারণা-বিশ্বাস ও মতবাদের দৌলতে জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের আচরণ ও কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভুলে পরিণত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই এ 'কওম' বা 'জাতি' শব্দটির ভুল প্রয়োগের দরুন হয়েছে।

'কওম'—জাতি এবং ইংরেজী ভাষায় 'নেশন' (Nation) প্রভৃতি শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে জাহেলী যুগের পরিভাষা। জাহেলী যুগের মানুষ নিছক সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে (Cultural Basis) কখনই জাতীয়তা (Nationality) স্থাপন করেনি—না প্রাচীন বর্বর যুগে, আর না অতি আধুনিক জাহেলী যুগে বংশীয় ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেম তাদের মন-মস্তিষ্কের মধ্যে এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, জাতীয়তা সম্পর্কীয় ধারণাকে তারা বংশীয় ও গোত্রীয় এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে সম্পর্কের প্রভাব থেকেই কখনোই মুক্ত করতে সমর্থ হয়নি। প্রাচীন আরবে 'কওম' (قوم) শব্দটি যেমন সাধারণভাবে একটি বংশ কিংবা একটি গোত্র সমুদ্ভূত লোকদের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হতো, বর্তমান যুগে 'নেশন' শব্দেও অনুরূপভাবে 'মিলিত বংশ' (Common Descent)-এর ধারণা অনিবার্যরূপে বর্তমান রয়েছে। আর এরূপ ধারণা ইসলামী সমাজ দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে কুরআন মজীদে 'কওম', এবং অনুরূপ অর্থবোধক আরবী শব্দ—-যথা شعب ইত্যাদি মুসলমানদের জামায়াত বুঝাবার জন্য পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, যে জামায়াতের সমাজ দর্শনের ভিত্তিমূলে রক্ত, মাটি, মাংস ও বর্ণগোত্র এবং ঐ ধরনের অন্যান্য কোনো বস্তুরই বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, সেই জামায়াতের জন্য এ ধরনের পরিভাষা কি করে ব্যবহৃত হতে পারে ! এটা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী সমাজ নিছক নীতি, আদর্শ, মতবাদ ও

আকীদা-বিশ্বাসের উপরই স্থাপিত হয়েছে এবং হিজরাত—দেশত্যাগ, বংশীয় সম্পর্ক ও জড় সম্বন্ধ কর্তনের মধ্য দিয়েই এ জামায়াতের সূচনা হয়েছে।

কুরআন মজীদে মুসলমানদের সম্পর্কে 'হিয্‌ব্‌' (حــزب) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে পার্টি বা দল। জাতি সৃষ্টি হয় বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে আর দল গঠিত হয় আদর্শ, মতবাদ ও নীতির উপর ভিত্তি করে। এজন্য 'মুসলমান' মূলত একটি জাতি নয়—একটি দলমাত্র। মুসলমানগণ একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তার অনুসারী বলেই তারা দুনিয়ার অন্যান্য সকল লোক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এরা ঠিক ঐজন্যই পরস্পর পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। আর যাদের সাথে এ নীতি ও আদর্শ মতবাদের দিক দিয়ে তারা যতই নিকটবর্তী হোক না কেন—তাদের সাথে এদের কোনোই সম্পর্ক হতে পারে না। কুরআন মজীদ ভূ-পৃষ্ঠের এ বিপুল জনতার মধ্যে কেবল দুটি পার্টিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছে ঃ একটি হচ্ছে আল্লাহর দল (حِـزْبُ اللّٰه) আর অপরটি হচ্ছে শয়তানের দল (حِـزْبُ الشَّيْطَان)। শয়তানের দলের পরস্পরের মধ্যে নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে যতই পার্থক্য ও বিরোধ হোক না কেন, কুরআনের দৃষ্টিতে তা সবই এক। কারণ, তাদের চিন্তা, পদ্ধতি ও কর্মনীতি কোনো দিক দিয়েই ইসলামী নয়। আর খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্র ব্যাপারে মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সকলেই এক শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে সম্পূর্ণরূপে একমত। কুরআন বলছে ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰۤئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلاَ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ المجادلة : ١٩

"শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে, সে তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ-অনবহিত করে রেখেছে। এরা শয়তানের দলের লোক। জেনে রাখ, শয়তানের দল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম হবেই।"

—সূরা মুজাদালা ঃ ১৯

পক্ষান্তরে আল্লাহর দলের লোক বংশ, জন্মস্থান, ভাষা ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে পরস্পরে যতই বিভিন্ন হোক না কেন—তাদের পূর্বপুরুষদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের শত্রুতা হয়ে থাকলেও—আল্লাহ প্রদত্ত চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থায় যখন তারা মিলিত হয়েছে, তখন আল্লাহর কর্তৃত্ব সম্পর্কে তাদেরকে নিবিড়ভাবে পরস্পর সংযুক্ত ও গ্রথিত করে দিয়েছে। এ নতুন দলে দাখিল হওয়ার সাথে সাথেই শয়তানের দলের লোকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

দলের এ পার্থক্য (অনেক সময়) পিতা-পুত্রের সম্পর্কও ছিন্ন করে দেয়। এমনকি, পুত্র পিতার উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়! হাদীসে বলা হয়েছেঃ

لايتوارث اهل ملتين-

"দুটি পরস্পর বিরোধী 'মিল্লাতের' লোক পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না।"

দলের এ পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এমনকি, এ 'দলগত বিরোধ' দেখা দেয়ার সাথে সাথেই পরস্পরের মিলন হারাম হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ এই যে, উভয়ের জীবনের পথ পরস্পর বিরোধী দিকে চলে গেছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط - الممتحنة : ١٠

"এরা (স্ত্রীগণ) তাদের (পুরুষদের) জন্য হালাল নয়, আর তারা (পুরুষগণ)-ও এদের (স্ত্রীদের) জন্য হালাল নয়।"

এ দলীয় পার্থক্য একটি বংশ—একটি গোত্রের মানুষদের মধ্যে পরিপূর্ণ সামাজিক 'বয়কট' ও সম্পর্কচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এমনকি, নিজ বংশ ও গোত্রের যেসব লোক 'শয়তানের দলের' অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর দলের লোকদের পক্ষে তাদের সাথে বিবাহ-শাদী করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কুরআন বলেছে ঃ "মুশরিক স্ত্রীলোকদের বিয়ে করো না—যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক বেগম অপেক্ষা উত্তম, তারা তোমাদের যতই মনমত হোক না কেন। এবং মুশরিক পুরুষদের কাছেও তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিও না—যতক্ষণ না তারা ইসলাম কবুল করে। ঈমানদার ক্রীতদাস হলেও মুশরিক স্বাধীন লোক অপেক্ষা অনেক ভাল—যদিও তাদেরকে তোমরা অধিক পসন্দ করো।"

দলের এ পার্থক্য বংশীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত জাতীয়তার সম্পর্ক কেবল ছিন্নই করে না, উভয়ের মধ্যে এক বিরাট ও স্থায়ী দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর দলের নীতি গ্রহণ করবে, ততক্ষণ এ দ্বন্দ্ব ও পার্থক্যের আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকবে।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ

اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلاَّ قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ـ الممتحنة : ٤

"ইবরাহীম এবং তাঁর সাথীদের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের (বংশ সম্পর্কীয়) জাতিকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিল যে, তোমাদের ও তোমাদের উপাস্য ঐসব মাবুদদের (দেবদেবী) সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিচ্ছিন্ন। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক চিরন্তন শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে—যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। অবশ্য ইবরাহীম যে তাঁর কাফের পিতার ক্ষমার জন্য দোয়া করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন—তাঁর এ কথায় তোমাদের জন্য কোনো আদর্শ নেই।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط ـ التوبه : ١١٤

"ইবরাহীমের পিতার জন্য তাঁর ক্ষমার দোয়া করা শুধু একটি প্রতিশ্রুতির কারণে হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৪

একটি পরিবারের লোকদের এবং নিকটাত্মীয়দের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কও এ দলের পার্থক্য হওয়ার কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি পিতা, ভাই ও পুত্র যদি শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, এবং এটা সত্ত্বেও আল্লাহর দলের লোক যদি তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, তবে তাঁর নিজ দলের সাথে তার গাদ্দারী করা হবে, সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط .... اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ ـ المجادلة : ٢٢

"কোনো একটি দল আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়েও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বতা করে—এমন (অবস্থা) কখনো (দেখতে) পাবে না। সেই সব লোক তাদের পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। .... বস্তুত উক্ত দল নিশ্চিতরূপে আল্লাহর দল। আর জেনে রাখ, আল্লাহর দলই প্রকৃত সাফল্য লাভ করবে।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২২

পার্টি বা 'দল' অর্থে কুরআন মজীদে অন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে উম্মাত। হাদীসেও এ শব্দটির বহুল ব্যবহার হয়েছে। বিশেষ কোনো সংগঠক জিনিস, যা লোকদের একত্রিত করে—যে লোকদের মধ্যে কোনো সর্বসম্মত ঐক্যসূত্র রয়েছে, তাদেরকে সেই সূত্র মূলের দৃষ্টিতেই 'এক উম্মাত' বলা হবে। এজন্য বিশেষ কোনো যুগ ও কালের লোকদেরও 'উম্মাত' বলা হয়। এক বংশ কিংবা এক দেশের অধিবাসীদেরও 'উম্মাত' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যে সর্বসম্মত ঐক্যমূল মুসলমানদেরকে এক উম্মাতে পরিণত করেছে, তা বংশ-গোত্র, জন্মভূমি কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য নয়, বরং তা হচ্ছে তাদের জীবনের প্রকৃত 'মিশন' এবং তাদের দলের আদর্শ ও নীতি। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران : ١١٠

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সত্য ও সৎকাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় পাপ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের অচল-অটল বিশ্বাস রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ

عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط - البقرة : ١٤٣

"এরূপেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মাত সৃষ্টি করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা বিশ্ব-মানবের 'পথপ্রদর্শক' হবে এবং তোমাদের পথপ্রদর্শক হবেন স্বয়ং রাসূল।"–সূরা বাকারা ঃ ১৪৩

এ আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এখানে 'উম্মাত' অর্থ মুসলমান একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দল (International Party)। একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী এবং একটি

বিশেষ কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ করতে ও একটি বিশেষ 'মিশন' সম্পন্ন করতে প্রস্তুত লোকদেরকে দুনিয়ার সকল দিক থেকে এনে এ দলে সংঘবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরা যেহেতু সকল জাতির মধ্য থেকেই নির্গত হয়ে এসেছে, এ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ জাতির সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রইলো না—এজন্যই এরা 'মধ্যবর্তী' দল নামে অভিহিত হতে পারে। সকল জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তাদের সাথে এদের এক নতুনতর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তা এই যে, এ মধ্যবর্তী দল দুনিয়ায় আল্লাহর ফৌজের দায়িত্ব পালন করবে। "তোমরা মানবজাতির উপর পর্যবেক্ষক—পথপ্রদর্শক" কথাটি প্রমাণ করে যে, মুসলমানকে দুনিয়ায় আল্লাহর তরফ থেকে সৈনিকের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং "মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" বাক্যাংশ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মুসলমান একটি আন্তর্জাতিক 'মিশন' নিয়ে এসেছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার দলের একচ্ছত্র নেতা হযরত মুহাম্মাদ স.-কে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা ও কর্মের যে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাকে সমগ্র মানসিক, নৈতিক ও বৈষয়িক জড়-শক্তির সাহায্যে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অপর সকল মত ও পথকে পরাজিত করতে হবে। এ দায়িত্ব সমগ্র মুসলমানের উপর অর্পণ করা হয়েছে বলেই তাদের সকলেই একটি উম্মাতে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানদের সমষ্টিগত রূপ বুঝাবার জন্য নবী করীম স. তৃতীয় যে পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে 'জামায়াত'। এ শব্দটিও 'হিযব' (حِزْب)-এর ন্যায় 'দল' অর্থবোধক। عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةَ –"দলবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য" এবং يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ –"জামায়াতের উপরই হয় আল্লাহর রহমতের হাত" প্রভৃতি হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, নবী করীম স. ইচ্ছা করেই কওম (قَوْم) বা 'শোয়োব' (شُعَب) কিংবা সমার্থবোধক শব্দসমূহ ব্যবহার করেননি এবং তদস্থলে 'জামায়াত' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি একথা বলেননি যে, "সবসময় তোমার জাতির সমর্থন কর" বা "জাতির উপরই আল্লাহর হাত রয়েছে।" সকল অবস্থায়ই তিনি কেবল 'জামায়াত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এর একমাত্র কারণ এই—এটাই হতে পারে যে, মুসলমানদের সামাজিক রূপ ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বুঝাবার জন্য 'কওম'-এর পরিবর্তে জামায়াত, হিয্‌ব ও দল প্রভৃতি শব্দই বিশেষ উপযোগী ও সঠিক ভাব প্রকাশক। জাতি বা 'কওম' শব্দটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার দৃষ্টিতে এক ব্যক্তি যে কোনো নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী হয়েও জাতির

অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কারণ সে উক্ত জাতির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। তার নাম, জীবনযাপনের ধরন এবং সামাজিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের দিক দিয়ে উক্ত জাতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু পার্টি-দল বা জামায়াত এবং 'হিয্‌ব' শব্দের অর্থের দিক দিয়ে নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করা না করাই হয় পার্টি বা দলের মধ্যে থাকা না থাকার একমাত্র ভিত্তি। ফলে এক ব্যক্তি কোনো দলের নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করে কখনই তার মধ্যে গণ্য হতে পারে না—তার নাম পর্যন্ত নিজের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারে না। তার প্রতিনিধি হতে পারে না, তার স্বার্থের সংরক্ষণকারীও হতে পারে না। এমনকি, দলের অন্যান্য লোকদের সাথেও তার কোনরূপ সহযোগিতা থাকতে পারে না। যদি কেউ বলে ঃ আমি নিজে যদিও এ দলের নীতি ও আদর্শের সমর্থক নই ; কিন্তু আমার পিতামাতা যেহেতু এ দলেরই সদস্য ছিলেন এবং আমার নাম এ দলের লোকদের নামের মতই ; এজন্য দলের সকল লোকদের ন্যায় আমারও অধিকার রয়েছে এবং তা আমার লাভ হওয়া আবশ্যক—তবে একথাটি এতই হাস্যকর বিবেচিত হবে যে, এটা শুনলে ঐ ব্যক্তির মাথা খারাপ হয়েছে বলে ধারণা হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু পার্টির অন্তর্নিহিত এ ধারণা পরিত্যাগ করে 'জাতির' ধারণা মেনে নিলে এ ধরনের হাস্যোদ্দীপক কার্যকলাপ করার বিরাট অবকাশ থেকে যায়।

ইসলাম তার আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন পার্টির সদস্যদের মধ্যে ঐক্যভাব এবং সামাজিক সামঞ্জস্য ও অবৈষম্য সৃষ্টির জন্য তাদেরকে একটি সাংগঠনিক সমাজে রূপায়িত করার জন্য—নিজেদের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। সেই সাথে তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য এমন দীক্ষার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছে, যার ফলে তারা গোড়া থেকেই দলের আদর্শ ও নীতির অনুসারী হয়ে উঠতে পারবে এবং প্রচারের সাথে সাথে বংশ বৃদ্ধির সাহায্যে দলের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত এখান থেকেই এ দল একটি জাতিতে পরিণত হতে শুরু করে। উত্তরকালে সংযুক্ত সামাজিকতা, বংশীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য তার জাতীয়তাকে দৃঢ় করে।

এখন পর্যন্ত যাকিছু হয়েছে—ঠিকই হয়েছে। কিন্তু মুসলমান যে একটি পার্টি এবং পার্টি হওয়ারই উপরই তাদের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে—ধীরে ধীরে তারা একথা ভুলে যেতে লাগলো। এ ভ্রান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এতদূর অধোগতি ঘটেছে যে, পার্টি সম্পর্কীয় ধারণার স্থানে জাতি সম্পর্কীয় ধারণা এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতপর মুসলমান একটি জাতি মাত্র হয়ে রইল—যেমন জার্মান একটি জাতি, জাপান একটি জাতি কিংবা ইংরেজ একটি জাতি। ইসলাম যেসব নীতি ও আদর্শের উপর তাদেরকে এক

'উম্মাত' রূপে গড়ে তুলেছিল, তাই যে একমাত্র মূল্যমান ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস—বর্তমানে মুসলমান একথা একেবারেই ভুলে বসেছে। যে বিরাট 'মিশন'কে সুসম্পন্ন করার জন্য ইসলাম অনুসারীদেরকে একটি দলে সংগঠিত করে দেয়া হয়েছিল, তা তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। তাদের নিজস্ব সকল মৌলিক তত্ত্ব ভুলে গিয়ে অমুসলিমদের কাছ থেকে জাতীয়তার জাহেলী ধারণা গ্রহণ করেছে। এটা এতদূর মারাত্মক ও মূলগত ভুল এবং এর দুষ্ট প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী যে, এটা দূর না করে ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই শুরু করা সম্ভব নয়।

একটি পার্টির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে যে ভালবাসা, সহানুভূতি, ভ্রাতৃভাব ও সহযোগিতার ভাবধারার সৃষ্টি হয়, তা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে নয়, বরং তারা সকলেই এক নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী বলেই এটা অনিবার্যরূপে হয়ে থাকে। দলের একজন সদস্য দলের নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করে কোনো কাজ করলে দলের অন্যান্য লোকদের পক্ষে তার সাহায্য করা কর্তব্য নয়। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তাকে এ বিদ্রোহমূলক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করাই সকলের কর্তব্য হয়। তা সত্ত্বেও যদি সে তা থেকে বিরত না থাকে, তবে দলীয় নিয়ম-শৃংখলা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। আর তাও ফলপ্রসূ না হলে তাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করতে হয়। দলীয় আদর্শের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়—তার উদাহরণও কিছুমাত্র বিরল নয়।[১]

কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন ! তারা নিজেদেরকে 'পার্টি' মনে না করে জাতি বলে বুঝছে ; এর দরুন তারা কঠিন ভ্রান্তিবোধে নিমজ্জিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ নিজের স্বার্থের জন্য ইসলামের বিপরীত নীতি অনুসারে কাজ করলে অন্যান্য মুসলমান তার সাহায্য করবে বলেই সে আশা করতে থাকে। আর তারা সাহায্য না করলে "মুসলমান মুসলমানের কাজে সাহায্য করে না" বলে অভিযোগ করতে শুরু করে। কেউ কারো জন্য সুপারিশ করলে বলে ; একজন মুসলমানের সাহায্য করা দরকার। সাহায্যকারীও একে একটি ইসলামী সহানুভূতি বলে অভিহিত করে। এ সমগ্র ব্যাপারেই শুনতে পাওয়া যায় ; প্রত্যেকেরই মুখে ইসলামের কথা—ইসলামী সাহায্য, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামী সম্পর্ক, কিন্তু কেউই একথা এক নিমিষের তরেও চিন্তা করে না যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে

১. ইসলামী রাষ্ট্রে মুরতাদকে হত্যা করার এটাই কারণ। কমিউনিস্ট রাশিয়ার কমিউনিজম ত্যাগকারী ব্যক্তিকেও এ শাস্তি দেয়া হয়।

ইসলামের দোহাই দেয়া—ইসলামের নামে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সাহায্য করা—একেবারেই অর্থহীন। বস্তুত যে ইসলামের তারা নাম করে, তা যদি বাস্তবিকই তাদের মধ্যে বর্তমান থেকে থাকে তবে তারা ইসলামী জামায়াতের কোনো লোক ইসলামের বিপরীত কাজ করছে শুনতে পেলেই তার বিরোধিতা করতে শুরু করতো এবং তাকে তা থেকে তাওবা করিয়ে ছাড়তো। সাহায্য করা দূরের কথা—কোনো জীবনী শক্তি সম্পন্ন ও সচেতন ইসলামী সমাজে ইসলামী নিয়ম-নীতির বিপরীত কাজ করার সাহসই কারো হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানকালের মুসলিম সমাজে দিন-রাত এটাই হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ এটাই—এবং এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মুসলমানদের মধ্যে জাহেলী জাতীয়তা জেগে উঠেছে। কাজেই আজ যাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলে অভিহিত করা হয়, মূলত এটা অমুসলিমদের কাছ থেকে ধার করা জাহেলী জাতীয়তার সম্পর্ক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এ জাহেলী ধারণার প্রভাবেই মুসলমানদের মধ্যে 'জাতীয় স্বার্থ' সম্পর্কে একটি আশ্চর্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আর মুসলমানগণ তাকেই ইসলামী স্বার্থ নামে অভিহিত করছে। মুসলমান নামে পরিচিত লোকদের উপকার হবে তাদের ধন-সম্পদ লাভ হবে, সম্মান-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, শক্তি ও সামর্থ্য তারা লাভ করতে পারবে, আর কোনো না কোনো রূপে এ দুনিয়া তাদের জন্য সুখের দুনিয়ায় পরিণত হবে—এটাই হচ্ছে তথাকথিত ইসলামী স্বার্থ। কিন্তু এ স্বার্থ ও উপকারিতা ইসলামী দৃষ্টিভংগী ও আদর্শ অনুসারে অর্জিত হচ্ছে কিংবা তার বিরোধিতা করেই তা লাভ হচ্ছে, সেদিকে মাত্রই লক্ষ্য করা হয় না। সাধারণত জন্মগতভাবে ও মুসলমান পরিবারে প্রসূত লোকদেরকেই 'মুসলমান' নামে অভিহিত করা হয়। তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি ইসলামী না হলেও তার মুসলমানিত্বে কোনো ব্যতিক্রম হয় না বলেই মনে করা হয়। এর অর্থ এই যে, বাহ্যিক দেহকেই 'মুসলমান' মনে করা হয়—তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারাকে মুসলমান মনে করা হয় না। ফলে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ছাড়াও এক ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে। এ ভুল ধারণার ফলেই যেসব বাহ্যিক মুসলমানকে মুসলমান বলা হচ্ছে, তাদের হুকুমাতকেও 'ইসলামী হুকুমাত' বলেই অভিহিত করা হয়। তাদের উন্নতিকে ইসলামী উন্নতি তাদের স্বার্থকে ইসলামী স্বার্থ বলে ঘোষণা করা হয়। এ হুকুমাত এবং এ স্বার্থ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চললেও তাদের কোনো ক্ষতি নেই। জার্মানী হওয়া যেমন কোনো নীতি বা আদর্শ নয়, বরং এটা একটি জাতীয়তার নামমাত্র; এবং একজন জার্মান জাতীয়তাবাদী যেমন কেবল জার্মানের লোকদের উন্নতির

জন্যই চেষ্টা করে—তা যে পন্থায়ই হোক না কেন। মুসলমানিত্বকেও অনুরূপ ভাবে একটি জাতীয়তা বলে মনে করা হয়েছে এবং মুসলমান জাতীয়তাবাদী লোকেরা কেবল নিজ জাতিরই প্রতিপত্তি ও উৎকর্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করে। এ উন্নতি ও প্রতিপত্তি নীতিগতভাবে এবং কার্যত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির অনুসরণের ফলেই লাভ হলেও এদের কাছে আপত্তির কোনো কারণ হয় না—এটা কি জাহেলী ধারণা নয় ? মুসলমান যে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দল, বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য একটি বিশেষ মতাদর্শ ও বাস্তব কর্মসূচী সহকারেই গণ্য করা হয়েছে—একথা কি আজ প্রকৃতপক্ষেই ভুলে যাওয়া হয়নি ? উক্ত মতাদর্শ ও কার্যসূচীকে বাদ দিয়ে কোনো মুসলমান ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে অন্য কোনো মতাদর্শ অনুযায়ী কোনো কাজ করলে তাকে ইসলামী কাজ কিরূপে বলা যেতে পারে ? পুঁজিবাদী নিয়মের অনুসারীকে কি কোথাও 'কমিউনিস্ট' বলে অভিহিত করা যায় ! পুঁজিবাদী সরকারকে কি কখনো কমিউনিস্ট সরকার বলা যায় ! ফ্যাসীবাদী প্রতিষ্ঠানকে কখনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় ! —পরিভাষাসমূহ এরূপে কেউ ব্যবহার করলে সকলেই তাকে মূর্খ ও অজ্ঞ বলে বিদ্রূপ করবে। অথচ বর্তমান সময় 'ইসলাম' ও 'মুসলমান' এ পরিভাষা দুটির বিশেষ অপব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তাকে কেউ ইসলামের বিপরীত বলে ধারণা করে না।

'মুসলিম' শব্দটিই প্রমাণ করে যে, এটা কোনো জাতিবাচক শব্দ নয় — বরং এটা গুণবাচক নাম এবং মুসলমানের একমাত্র অর্থ—ইসলামের অনুসারী। এটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থই হতে পারে না। এটা মানুষের মধ্যে ইসলামের বিশেষ মানসিক, নৈতিক ও কর্মগত গুণকেই প্রকাশ করে। কাজেই এ শব্দটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য সেভাবে ব্যবহার করা যায় না, যেমন ব্যক্তি-হিন্দু ও ব্যক্তি-জাপানী কিংবা ব্যক্তি-চীনার জন্য হিন্দু, জাপানী অথবা চীনা প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। মুসলমান নামধারী ব্যক্তি যখনি ইসলামের নীতি থেকে বিচ্যুত হয় মুসলমান হওয়ার মর্যাদা তার কাছ থেকে তখনি এবং নিজে নিজেই ছিন্ন হয়ে যায়। অতপর সে যা কিছুই করে, ব্যক্তিগত হিসেবেই করে। তখন ইসলামের নাম ব্যবহার করার তার কোনোই অধিকার থাকে না। অনুরূপভাবে 'মুসলমানের স্বার্থ' মুসলমানদের উন্নতি রাষ্ট্র ও মন্ত্রিত্ব মুসলমানদের সংগঠন—প্রভৃতি শব্দ ও পরিভাষাসমূহ ঠিক তখনি ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন এটা সবই ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসারে হবে, ইসলামের আসল 'মিশন' পূর্ণ করার দৃষ্টিতে সম্পন্ন হবে। অন্যথায় উল্লিখিত কোনো জিনিসের সাথেই মুসলমান শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ

ইসলামের গুণকে বাদ দিয়ে মুসলমান বলতে কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই। কমিউনিজমকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতিকেই কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করার ধারণাও করা যায় না। এবং এভাবে কোনো স্বার্থকেই কমিউনিস্ট স্বার্থ, কোনো রাষ্ট্রকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং কোনো সংগঠনকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলা যায় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা মানব মনে কেন বদ্ধমূল হয়েছে ? ইসলামকে বাদ দিয়েও কোন ব্যক্তি বা জাতিকে 'মুসলমান' বলে কিরূপে অভিহিত করা যায় ?

এ ভ্রান্তিবোধই মূলগতভাবে মুসলমানদের তাহযীব, তামাদ্দুন এবং ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল আচরণ করা হচ্ছে। ইসলামের বিপরীত নীতি ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র-সরকারসমূহকে 'ইসলামী হুকুমাত' বলে অভিহিত করা হয়। শুধু এজন্যই যে, তার সিংহাসনের উপর মুসলমান নামধারী এক ব্যক্তি আসীন হয়েছে। বাগদাদ, কর্ডোভা, দিল্লী ও কায়রোর বিলাসী দরবারে যে তাহযীব ও তামাদ্দুন প্রতিপালিত হয়েছিল, আজ তাকেই ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন বলে গৌরব করা হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলামী তাহযীব সম্পর্কে একজন মুসলমানের কাছে প্রশ্ন করা হলেই অমনি আগ্রার তাজমহল দেখিয়ে দেয়। মনে হয় তাই যেন তার দৃষ্টিতে ইসলামী তাহযীবের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নিদর্শন। অথচ একটি শবদেহ দাফন করার জন্য অসংখ্য একর জমি স্থায়ীভাবে ঘেরাও করে তার উপর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতঃ প্রাসাদ তৈরি করা কোনোক্রমেই ইসলামী তাহযীব হতে পারে না।

এরূপে ইসলামী ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হলেই আব্বাসীয়, সেলজুকীয় এবং মোগলীয় সম্রাটদের কীর্তি-কাহিনী পেশ করা হয়। অথচ প্রকৃত ইসলামী ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিতে ঐসব কীর্তি কাহিনীর বেশির ভাগই গৌরবের বস্তু না হয়ে অপরাধের তালিকায় লিখিত হওয়ার যোগ্য বলে নিরূপতি হবে। মুসলমান রাজা-বাদশাহদের ইতিহাসকে 'ইসলামী ইতিহাস' নামে অভিহিত করা হয়। অন্য কথায় রাজা-বাদশাহদেরই নাম হয়েছে ইসলামের 'মিশন' এবং তার মতবাদ ও নিয়ম-নীতির দৃষ্টিতে অতীত ইতিহাসের যাচাই করা এবং সুবিচারের শাণিত মানদণ্ডে ইসলামী কীর্তি ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে মুসলমান নামধারী শাসকদের সমর্থন ও প্রতিরোধ করাকেই ইসলামী ইতিহাসের খেদমত মনে করা হয়েছে। দৃষ্টিভংগী, দৃষ্টিকোণ এবং বিচার পদ্ধতির এ মৌলিক পার্থক্যের একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানদের প্রত্যেকটি জিনিসকেই 'ইসলামী' মনে করার

একটি স্থায়ী ভ্রান্তিবোধ সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এবং মুসলমান নামে পরিচিত ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী নীতি-পদ্ধতিতে কাজ করলেও তার কাজকে মুসলমানের কাজ—তথা ইসলামী কাজ বলে মনে করা হয়।

মুসলমানগণ তাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এ ভুল দৃষ্টিভংগীই গ্রহণ করেছে। ইসলামের নীতি আদর্শ ও মতবাদ এবং তার মিশনকে উপেক্ষা করে—তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে—একটি জাতিকে মুসলিম জাতি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এ জাতির পক্ষ থেকে কিংবা তার নামে অথবা তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেকটি দলই চরম স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেছে। তাদের মতে মুসলিম জাতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলমানের প্রতিনিধি—শুধু তাই নয় তাদের নেতাও হতে পারে, ইসলাম সম্পর্কে বেচারা যদি একেবারে অজ্ঞ মূর্খ হয়, তবু কোনো ক্ষতি নেই। কোনো প্রকার উপকারিতা বা স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা দেখলেই মুসলমান সকল ব্যক্তি ও দলের পশ্চাতে চলতে প্রস্তুত হয়ে পড়ে—এর মিশন ইসলামের মিশনের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা কোনো দোষের মনে করে না। মুসলমানের জন্য অন্ন সংস্থান হচ্ছে দেখলেই তারা খুশিতে আত্মহারা হয়—ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারামের অন্ন হলেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কোথাও একজন মুসলমানকে ক্ষমতার আসনে আসীন দেখতে পেলেই খুশিতে বুক স্ফীত হয়। সে একজন অমুসলমানের ন্যায় ইসলামের বিপরীত উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করলেও কোনো আপত্তি হয় না। অসংখ্য গায়র-ইসলামী জিনিসকে এখানে ইসলামী ধরে নেয়া হয়েছে। ইসলামের আদর্শ ও সংগঠন নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়ম-নীতি অনুসারে যেসব দল গঠিত হয়েছে, মুসলমান সেই দলের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায় এবং এসব উদ্দেশ্য লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। .... মুসলমানকে নিছক একটি জাতি মনে করা এবং তাদেরকে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দল মনে করার কথা ভুলে যাওয়ার দরুনই মুসলমান সম্পর্কীয় মত ও তৎসংক্রান্ত কাজেকর্মে এ অবাঞ্ছিত ভুল দেখা গেছে। মুসলমানদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা দূর করে তাদেরকে একটি আদর্শবাদী দল যতদিন না মনে করা হবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনের কোনো কাজেই সঠিক আচরণ হতে পারে না।

—তরজুমানুল কুরআন, এপ্রিল, ১৯৩৯ইং

পরিশিষ্ট

'ইসলামী জামায়াত'কে জাতি না বলে অভিহিত করলে তা কোনো আঞ্চলিক জাতীয়তার অংশ হয়ে থাকার অবকাশ থেকে যায় বলে অনেকের মনে সন্দেহ হতে পারে। একটি জাতির মধ্যে যেমন বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আদর্শ সত্ত্বেও তারা সকলেই 'জাতি' নামক বিরাট সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকে। এভাবে 'মুসলমান' যদি একটি পার্টি হয়, তবে তারাও নিজ দেশের আঞ্চলিক জাতীয়তার একটি অংশে পরিণত হতে পারে, এরূপ সন্দেহ কারো কারো মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু এ ভুল ধারণা সৃষ্টির একমাত্র কারণ এই যে, জামায়াত বা পার্টি বলতে সাধারণ রাজনৈতিক পার্টি বলেই মনে করা হয়। কিন্তু তার আসল অর্থ এটা নয়। দীর্ঘকাল যাবত এ অর্থেই তার ব্যবহার হচ্ছে বলেই এর সাথে এ অর্থ—ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। মূলত যারা একটি বিশেষ মতবাদ—আকীদা-বিশ্বাস, নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মিলিত হয়, তারাই একটি জামায়াত—একটি পার্টি। কুরআন মজীদে 'হিয্‌ব' ও 'উম্মাত' ঠিক এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হাদীস শরীফে 'জামায়াত' শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে, আর পার্টি বলতেও এটাই বুঝায়।

পক্ষান্তরে, একটি জাতির কিংবা একটি দেশের বিশেষ অবস্থার দৃষ্টিতে রাজনৈতিক তদবীর-তদারকের বিশেষ মত ও কার্যসূচী নিয়ে যারা সংঘবদ্ধ হয়, তারাও একটি পার্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের পার্টি কেবল রাজনৈতিক পার্টি হয় বলে তার পক্ষে কোনো জাতির অংশ হয়ে পড়া বিচিত্র নয় .... বরং স্বাভাবিক।

কিন্তু একটি সর্বাত্মক মত ও সঠিক আদর্শ নিয়ে যেসব লোক সংঘবদ্ধ হয়, তাদেরকেও একটি 'জামায়াত' বলা হয়। তারা জাতি ও দেশ নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সচেষ্ট ও যত্নবান হয়। এক নতুন আদর্শ ও পদ্ধতিতে সামগ্রিক জীবনের পুনর্গঠন করা হয় তার একমাত্র লক্ষ্য। তা নীতি, আদর্শ, মতবাদ, চিন্তাধারা এবং নৈতিক বিধান থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আচরণ ও সমষ্টিগত ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসকেই ঢেলে নতুন করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়। এক স্বতন্ত্র ও অভিনব তাহযীব ও তামাদ্দুন সৃষ্টি করার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি হয় না।—এ

'দল'ও মূলত যদিও একটি দল মাত্র, কিন্তু এটা কোনো বৃহদায়তন জাতির অংশ বা লেজুড় মাত্র হয়ে কাজ করার মত কোনো দল নয়। সংকীর্ণ জাতীয়তার বহু উর্ধে এর গতিবিধি। বরং যেসব বংশীয়, গোত্রীয় এবং ঐতিহ্যিক হিংসা-দ্বেষ ও বিরোধভাবের ভিত্তিতে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তা গড়ে উঠেছে, তা চূর্ণ করাই হয় তার প্রধানতম মিশন। কাজেই এরূপ একটি জামায়াত বা পার্টি ঐসব জাতীয়তার সাথে জড়িত হতে পারে না—বরং বংশীয়, গোত্রীয় ও ঐতিহাসিক জাতীয়তা চূর্ণ করে তদস্থলে সম্পূর্ণ বুদ্ধিভিত্তিক জাতীয়তার (Rational Nationality) সৃষ্টি করবে—জড়, স্থবির ও বন্ধ্যা জাতীয়তার পরিবর্তে একটি বর্ধিষ্ণু জাতীয়তা (Expeanding Nationality) গঠন করবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এটা নিজেই এমন এক নতুনতর জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যা বুদ্ধিগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে গোটা পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এটা একটি জাতীয় রূপ লাভ করার পরও মূলত এটা একটি 'দল' বা 'জামায়াত'ই হয়। কারণ জন্মগত অধিকারেই কেউ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, এর ভিত্তিগত নীতি, আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ এবং অনুসরণই হচ্ছে এর মধ্যে শামিল হওয়ার একমাত্র উপায়।

'মুসলমান' প্রকৃতপক্ষে এ দ্বিতীয় প্রকারেরই একটি দলের নাম। একটি জাতির মধ্যে যে বিভিন্ন রূপ দল হয়—এটা তেমন কোনো 'দল' নয়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহযীব-তামাদ্দুনের পতাকা নিয়ে উঠে যেসব দল এবং ছোটখাটো জাতীয়তার সংকীর্ণতম সীমা চূর্ণ করে নিছক নীতির ভিত্তিতে এক বিরাট বিশ্বজাতীয়তা (World Nationality) গঠন করতে চায় যে দল, এটা তদ্রূপই একটি দলমাত্র। এ 'দল' যেহেতু দুনিয়ার অন্যান্য বংশীয় কিংবা ঐতিহাসিক জাতীসমূহের কোনো একটির সাথেও নিজেকে অভ্যন্তরীণ হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে সংযুক্ত করতে প্রস্তুত নয়, বরং এটা নিজের জীবন দর্শন ও সমাজ দর্শন (Social Philosophy) অনুযায়ী নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুনের ইমারত প্রস্তুত করতে শুরু করে এ দৃষ্টিতে অবশ্য এটাকে একটি জাতি বলা যায়। কিন্তু এ দিক দিয়ে তা একটি 'জাতি' হওয়া সত্ত্বেও মূলত এটা একটি 'দল' মাত্র। কারণ কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে এ জাতির মধ্যে কারো জন্ম (Mere Accident of birth) হলেই সে এ 'জাতির' সদস্য হিসেবে গণ্য হতে পারে না—যতক্ষণ না সে এর আদর্শ ও নীতির অনুসারী হবে। তদ্রূপ অন্য কোনো জাতির মধ্যে কারো জন্ম হয়েছে বলেই সে তার জাতি থেকে নির্গত হয়ে এ জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তারও পথ রোধ করা হয় না। কারণ সে এ জাতির নীতি, আদর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসস্থাপন করেছে।

উপরের সমস্ত আলোচনার সারকথা এই যে, মুসলিম জাতি একটি স্বতন্ত্র জামায়াত বা দল হওয়ার কারণেই তার জাতীয়তা স্বীকৃত। মূলত তা একটি দল, পরবর্তী পর্যায়ে তা জাতীয়তার মর্যাদা লাভ করে মাত্র। প্রথমটা মূল দ্বিতীয়টি তার শাখা মাত্র। তার জামায়াত হওয়ার দিকটি কোনো সময় উপেক্ষিত হলে এবং নিছক একটি 'জাতি'তে পরিণত হলে তার চরম অধঃপতন (Degeneration) ঘটেছে মনে করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুত মানব সমাজের ইতিহাসে ইসলামী দলের মর্যাদা ও স্বরূপ এক অভিনব ও অপূর্ব জিনিস। এজন্য তা লোকদের জন্য বিস্ময়োদ্দীপকও বটে। ইসলামের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃস্টবাদ জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমা চূর্ণ করে দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিল এবং মতাদর্শের ভিত্তিতে এক সার্বিক মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রাতৃগোষ্ঠী গঠন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ উভয় ধর্মের নিকট তাহযীব ও তামাদ্দুনের সামগ্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী কোনো সমাজদর্শন আদৌ বর্তমান ছিল না—ছিল কতকগুলো নৈতিক উপদেশ মাত্র। ফলে এদের কোনো একটিও সার্বিক জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপন করতে সমর্থ হয়নি। এক প্রকার 'ভ্রাতৃত্ব' (Brotherhood) সৃষ্টি করেই তা শেষ হয়ে গেল। ইসলামের পরে পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উত্থান হয়, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার নিকট তা আবেদন করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রথম জন্মের দিনই তার ঘাড়ে জাতীয়তার 'ভূত' চেপে বসে। তাই আন্তর্জাতিক জাতীয়তা গঠনে এ-ও চরম ব্যর্থ হয়। অতপর মার্কসীয় কমিউনিজম সামনে উপস্থিত হয় এবং জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে সর্বাত্মক ধারণার ভিত্তিতে একটি বিশ্বব্যাপক জাতীয়তা ও সভ্যতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সে সভ্যতা এখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি বলে মার্কসবাদও কোনো বিশ্ব-ব্যাপক মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয়তার রূপ লাভ করতে পারেনি। .... আর সত্য কথা এই যে, মার্কসবাদ ইতিপূর্বেই জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত হয়ে তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। স্টালিন এবং তার দলের কর্মনীতিতে রুশ জাতীয়তাবাদ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। রুশীয় সাহিত্যে—এমনকি ১৯৩৬ সালে গৃহীত নতুন শাসনতন্ত্রে রুশকে 'পিতৃভূমি' (Father Land) নামে অভিহিত করে জাতীয়তা পূজার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম কোনো দেশকেই 'পিতৃভূমি' বলে অভিহিত করে না ; করে দারুল ইসলাম—'ইসলামের দেশ' নামে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা—যা বংশীয়-গোত্রীয় এবং ঐতিহাসিক জাতীয়তার সকল বন্ধন ছিন্ন করে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি বিশ্ব ব্যাপক মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয়তা গঠন

করতে পারে। এজন্যই যারা ইসলামের অন্তর্নিহিত আদর্শবাদী ভাবধারার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত নয়, তারা একই মানব সমষ্টি একই সময় 'জাতি' এবং 'দল' কেমন করে হতে পারে, তা মোটেই বুঝতে পারে না। তারা দেখতে পায় যে, দুনিয়ায় প্রত্যেক জাতির সদস্য ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট জাতির লোকদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ফলেই তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহের সাথে তাতে কেউ শামিল হয়নি। যে ব্যক্তি ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেছে, সে ইটালী জাতীয়তার সদস্য, কিন্তু যে ব্যক্তির জন্ম ইটালী দেশে হয়নি, তার পক্ষে ইটালী জাতির সদস্য হওয়ার কোনোই উপায় নেই—এটা সকলেই জানে। কিন্তু এমনও কোনো 'জাতি' হতে পারে, যাতে বিশেষ কোনো আদর্শ এবং মতবাদে বিশ্বাসস্থাপন করে শামিল হতে হয় এবং আদর্শ ও মতবাদ পরিবর্তিত হলে সে তা থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হয়—এমন কোনো জাতীয়তার সাথে দুনিয়ায় লোকদের সাধারণত কোনোই পরিচয় নেই। তাদের মতে এ বৈশিষ্ট্য তো কেবল একটি দলেরই হতে পারে—কোনো জাতির নয়। কিন্তু এ দলকে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং এক নতুন জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপন করতে দেখলেই—আর স্থানীয় জাতীয়তার সাথে নিজেকে জড়িত ও সীমাবদ্ধ করতে প্রস্তুত না হতে দেখেই তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে।

প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পারায় এ ব্যাপারটি কেবল অমুসলানদের বেলায় সত্য নয়, মুসলমানরাও আজ এতেই নিমজ্জিত রয়েছে। দীর্ঘকাল যাবত অনৈসলামী শিক্ষা-দীক্ষা লাভ ও ইসলাম-বিরোধী পরিবেশে জীবনযাপন করার দরুন তাদের মধ্যেও 'ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদের জাহেলী ধারণা জেগে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যই তাদেরকে গঠন করা হয়েছিল, তাদের আদর্শ প্রচার করাই ছিল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, দুনিয়ার ভুল সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজেদের জীবন দর্শনের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ প্রস্তুত করাই ছিল তাদের কর্তব্য ; কিন্তু মুসলমানগণ আজ একথা একেবারেই ভুলে বসেছে। আর এসব ভুলে গিয়ে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় নিছক একটি জাতিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। এখন তাদের বৈঠক, সভা-সমিতি, কনফারেন্স ও সম্মেলন এবং তাদের পত্রিকা ও পুস্তিকায় কোথাও তাদের এ আসল মিশনের কোনো আলোচনা বা উল্লেখ পর্যন্ত হতে শোনা যায় না। অথচ এজন্যই তাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্য থেকে বাছাই করে নতুন জাতি, নতুন উম্মাত বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে গেছে। আর মুসলমান বলতে বুঝায় তাদের, যারা মুসলমান নামধারী পিতা-মাতার বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। আর স্বার্থ বলতেও ঐসব বংশীয় মুসলমানের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক

স্বার্থ সুযোগ-সুবিধা লাভই বুঝাচ্ছে। আর কোথাও তার কালচার বা সংস্কৃতিও বুঝায়। এ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে পন্থা ও কর্মনীতিই অনিবার্য বিবেচিত হবে, মুসলমানগণ তাই গ্রহণ করতে দ্বিধাহীন চিত্তে অগ্রসর হবে—মুসোলিনী যেমন ইতালীয়ানদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রত্যেকটি কাজই করতে উদ্যত হতো। কোনো নীতি বা আদর্শের কোনো বালাই তার ছিল না। সে বলতো—ইটালী জাতির জন্য যাই উপকারী ও কল্যাণকর তাই সত্য। অনুরূপভাবে মুসলমানও বলছে ঃ মুসলমানদের জন্য যাই কল্যাণকর, তাই সত্য, তাই ন্যায়। আর এটাকেই আমি মুসলমানদের চরম অধঃপতনের নিদর্শন বলে অভিতিহ করি এবং এ অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই আমি মুসলমানদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করি যে, তোমরা মূলত কোনো বংশীয়, গোত্রীয় ও ঐতিহাসিক জাতিদের অনুরূপ একটি জাতি নও। প্রকৃতপক্ষে তোমরা একটি দল—একটি জামায়াত মাত্র এবং তোমাদের মধ্যে এ দল হওয়ার ভাবধারা (Party Sence) বর্তমান থাকলেই তোমাদের জীবন রক্ষা পেতে পারে, নতুবা নয়।

দল হওয়ার ভাবধারা জাগ্রত না থাকার দরুন—অন্যথায় আত্মভোলা হওয়ার মারাত্মক পরিণাম যে কত সাংঘাতিক, তা অনুমান করা যায় না। এর দরুন মুসলমান প্রত্যেকটি মত ও পথের অনুসরণ করতে শুরু করে, তা ইসলামী আদর্শের অনুকূল কি বিপরীত, আদৌ সে বিচার করা হয় না। মুসলমান তাই জাতীয়তাবাদী হয়, কমিউনিস্টও হয়। ফ্যাসীবাদেও দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাতে কোনোরূপ কুণ্ঠবোধ করে না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সমাজ দর্শন, মেটাফিজিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক মতের অনুসারী মুসলমান সর্বত্রই পাওয়া যাবে। মুসলমান অংশগ্রহণ করেনি—এমন কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা তামাদ্দুনিক আন্দোলন পৃথিবীর কোথাও নেই। আর মজার ব্যাপার তো এখানেই যে, তারা এর পরও নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করে, দাবী করে এবং মুসলমান নামেই তাদেরকে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মুসলমান যে কোনো জন্মগতভাবে প্রাপ্ত উপাধি নয়, এটা ইসলামের নির্দিষ্ট পথের অনুসারী লোকদেরই একটি গুণবাচক নামমাত্র—বিভিন্ন মত ও পথের পথিকদের সেই কথা আদৌ স্মরণ হয় না। বস্তুত ইসলামের জীবন ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করে যারা ভিন্নতর পথের অনুগামী হবে তাদেরকে 'মুসলমান' বলা একটি মারাত্মক ভুল, সন্দেহ নেই। মুসলিম জাতীয়তাবাদী, মুসলিম কমিউনিস্ট এবং এ ধরনের অন্যান্য পরিভাষাগুলো ঠিক ততখানি পরস্পর বিরোধী, যতখানি পরস্পর বিরোধী হচ্ছে কমিউনিস্ট মহাজন ও বুদ্ধ কশাই।–তরজুমানুল কুরআন ঃ জুন, ১৯৩৯ সাল।